* কবিতা
* গল্প
* ফিচার

//................কবিতা

এক পৃষ্ঠা প্রলাপ

অংশু মোস্তাফিজ

এতটা ভার কিভাবে নিই বলো
প্রতিদিনের দূঃসহপনা জীবনের নামে বয়।
একটা ধবল টিকটিকি হতে চেয়েছি মাত্র
মাকড়সার দামে এ জন্ম নয়।

আমার প্রথম পঁচিশ বেশ্যাপনার কেটে গেছে
তোমার সাথে দেখা হয়নি রুবাজি।
তোমরা যেগুলো ভাগ্য বলে মানো
আমি খেলি ক্লান্তির বাজি।
অস্বস্থি বলতে দু'বেলা ভাত- ক'টা সিগ্রেট
বাদে অবশিষ্ঠ। স্বস্থির কথা বললে
একটা জলপাই রঙ মদের বোতল।
এখন স্পষ্টবাদী তোমরা, বলো নষ্ট।
এই আমার কষ্ট- কিংবা একমুঠো আড়ষ্ট।

তবে কি আত্মহুতিই দিয়েছি আমার বিগত
সব বসন্তের দিনে। অদুরের ব্যর্থ সঙ্গমগুলো
বুকে ধরে কেবল এগিয়েছি একটা
ধবল টিকটিকির দিকে।
আমি আমাকে বন্ধক রেখে রুপাদের সাথে খেলেছি
অসাংবিধানিক বউছি। কিন্তু আমি
বিকেল শেষ করে অন্তত ঘরে ফিরতে চেয়েছিলাম।
ঘুমোতে চেয়েছিলাম বাতিঘর নিভিয়ে। আমার
হয়নি। আমার হয়নি রুবাজি। শান্তির
সঙ্গোমের নামে কেবল বৃদ্ধ হয়েছি দ্রুত।

রুবাজি, প্রিয়তমেষু, এই চোতের আসন্ন কোন
সন্ধ্যায় টিকটিকির সাথে দেহ বিনিময় হলেও
আরো ক'ফোটা বীর্য দরকার হবে আমার ।
তোমার জন্য ওটুকুই সম্পদ সম্পত্তি।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com
.....

সংক্রান্তি এই চৈত্রে

অংশু মোস্তাফিজ
কিছু ধবল মেঘ ঐক্যবদ্ধ হয়ে
খুব কাছের আকাশ দিয়ে ভেসে
ভেসে উড়ে যায়।
আর আমার ঘরের ছাদ আমাকে
বিচ্ছিন্ন করে। শাদা চুনকামের
দেয়াল সীমাবদ্ধতায় যখন অনবরত
অস্তিত্ব কাটে- আমি ভেঙ্গে যাই ক্রমশঃ।
নস্টালজিয়া আমাকে পোড়াতে পোড়াতে
কাগজেরও ছাই পোড়ে।
দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যাই করতে
থাকি অবিরল। আমার লাখো মানুষের একজন
হয়না শুধু হুমায়রা আনজুম।

কিছু মৌসুমী ভৌমিক অবরত বেজে যায়।
শুক্লদাদসের মত আজকাল আর হয়না চৈত্র
সংক্রান্তি ঝড়।
এবারের শীত দ্রুত কেটে গেল গ্রীষ্মে।
জিজ্ঞেস করে দেখো, ওরা তোমাকে দেখেছে।
আর আমার কালো শার্টের বাম পকেটের
নিচে তোমার আমার যন্ত্রণা এঁকেছে।

শুধুমাত্র ভালো দর্শক হতে পেরেছি।
জীবন দিয়ে দেখেছি, খুব চারদিকে
চিতা। আর পঞ্চান্ন চিত্র।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....

১২ এপ্রিল

অংশু মোস্তাফিজ
যা শুনেছি আমি তুমি শোননি।
যা বুঝেছি আমি তুমি বোঝনি।
আর কখনো প্রবল হৃদয়ের টানে
আলিঙ্গনের কথা ভাবা হবে না আমার।
সমুদ্দুর স্নানের নামে বালিচরে ভেসে
যাবো সব জ্যোৎস্নার রাত্রে।
মুখোমুখি দাঁড়াবো না রোদ জ্বলা দুপুরে।
কি অবাক কথা।
এই সবও আজকাল ভাবনার অংশ
হবার প্রয়োজনে কড়া নাড়ে। নিশ্চয়
তুমিও ঘুমোওনি পরশু।

কিন্তু দুজনেই আবার অংক ভুলে
একসাথে ঘুমোলে নিশ্চিত গড়ে উঠবে
সুন্দর উপবন। আমাদের প্রিয়
একজোড়া মন।
যা বোঝনি তুমি আমি বুঝেছি।
যা ভাবনি তুমি আমি ভেবেছি।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....

প্রিয় তিন মানুষ

অংশু মোস্তাফিজ

আর যশোর রোড- তোর জন্য শরীরের
ভারে আমি নত গেয়ে সন্তান প্রসবের
মত সুখে প্রাণ জুড়ান মৌসুমী ভৌমিক।
মৌসুমী ভৌমিক। কিংবা আমার মা,
তুমি বলেছিলে।

আর আমি তখন ঝিমুতে থাকি।
মৌসুমী ভৌমিক আবারো গেয়ে
ওঠেন, আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের
তীর ধরে নীল জল দিগন্ত-
আর আমি তখন ঝিমুতে থাকি। মুখোশ
নেবেন মুখোশ বলে চিৎকার করেন
মাহমুদুজ্জামান বাবু।
মাহমুদুজ্জামান বাবু। যিনি বলে
ফেলেছেন আমার কিছু কথা।
আমার কিছু ব্যথা।

আর তুমি তখন কচ্ছোপের মতন
পানি কেটে চলা লঞ্চের পাটাতনে বাঁকা
হয়ে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নাদীঘল চোখ।
আরো দক্ষিন থেকে ছুটে আসা বাতাসে
চুল ওড়াচ্ছো।
হুমায়রা আনজুম, আমি চাইনা
তোমার অভ্যন্তরে অনিখিলেশ মানুষের দল।
তবু একগন্ডা বরফ মেঘ ধরতে তুমি হাত
সচ্ছল বাড়াও।
আর আমি তখন ঝিমুতে থাকি।
তোমার চুল উড়ে চলে আরো আরো উত্তর দিকে।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....

অধ্যায় ১১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অংশু মোস্তাফিজ

অত্যন্ত যত্ন করে স্মৃতিগেড়ে বসে
পড়েছো অভ্যন্তরে। এখন
ভেতর বাইরে সামান্যতীত যন্ত্রণা কিংবা
ভালবাসা শব্দের দরকষাকষি।
মুখোমুখি বসবার অবাধ্য আরাধনা।
বুক বরাবর জড়ানোর স্বপ্ন বাসনা।
এই সময়ে সেই সব মানুষের একজন আমি
যারা শাদা পদ্মের খোঁজে রেল সড়ক
বেয়ে অনবরত হেঁটেছিল পৌরাণিক পুষ্কন্নির দিকে।
যারা মৃত্যুকে ধরে নিয়েছিল জন্মের প্রতিশব্দ।

প্রিয়তমেষু, একটা হিরোসিমা নাগাসাকির
চেয়ে কম দগ্ধ হয়নি বুক। তোমার
দিকে তাকাতেই পঙ্গু বোধে তাই বন্ধ
হয়ে আসে চোখ।
কালো পাথরের অবিরল ক্ষয়ের মত এখন
আমার বুকের সীমানা মাপি।
যেভাবে খরস্রোতারা ক্রিকেটের মাঠ হয়
তেমনি ঝিমুতে থাকি মারিজুয়ানায়।
তোমার জ্যোৎস্নামাখা ঠোঁট চুম্বন করতে গেলে
দু'বেলা ভাতের দামে শিরদাড়া ভাঙ্গে রাষ্ট্র।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....

অবশিষ্ট দীর্ঘশ্বাস

অংশু মোস্তাফিজ
কেবল কখনো কখনো দারুন ঘৃণা
নিয়ে তোমাকে ডেকেছি।
কেবল তোমাকে দেখেছি আক্রোশভরা চোখে।
এবার ধ্যানমগ্ন মেঘবালিকার মতন বর্ষাকন্যা
একসাথে সারেনি গ্রীষ্মকালীন জলদ।
আমি তোমাকে দাঁড় করিয়েছি এক্সপ্রেস
ট্রেনের একশ' গজ সম্মুখে।
তুমি ট্রামের হর্ণের চেয়ে নাকি বেশি
কিছু শোননি আর।

আমার শ্রাবন্তীর সোনামুখ নদীতে
মধ্য দুপুরের নির্ভার চিহ্ন মিশে মিশে যায়।
কৈশোরের তুলসীগঙ্গা আজো
কলকল বয়ে চলে তিলকপুরের ধার দিয়ে।
আমি চিৎকার করে উঠি দূঃস্বপ্ন ছেড়ে
ঘুম ভাঙয়ার সুখে। প্রিয় রুবা,
আমি যদি হিংস্র হতাম!

একদিন সন্ধ্যা ঝড়ের মাঝে একমুঠো শাদা
আলো দেখে তবু আস্থা পাবে।
বিকেলের একদিন ভীষন নীল দেখে
সুতোটুকোয় বেঁধে প্রাণপাখি উড়াবে।
আর আমি কি কষ্ট নিয়ে তাকাবো তোমার দিকে।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....গল্প .....

অ-পুরুষ

অংশু মোস্তাফিজ

পাখির ডাকে ঘুম ভাংলো আমার। আধো আধো ঘুমে বেশ কিছু ক্ষণ ধরেই পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে বুঝলাম এটা নকল পখির ডাক। মোবাইল ফোনের রিংটোন। আমার পাশের সিটে বসা মেয়েটির ফোনে একের পর এক কল আসছে। মেয়েটি কোন কলই রিসিভ করছেনা। কাটছেও না। কেবল দেখছে। আমি স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েটির দিকে তাকালাম। সুন্দরী মেয়ে। এ রকম এক সুন্দরী মেয়ের সাথে আমার প্রেম হয়েছিল। এ মেয়েটি বয়সে আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবে। শাদা টি শার্টের উপর হালকা নীল জিন্সের শার্ট পরা। জিন্সের প্যান্টও। মাঝ পিঠ বরাবর চুল ছড়ানো। ওর চুল কালোও নয় বাদামীও নয়। বেশ কিছুদিন আগে বাদামী করা হয়েছিল বলে মনে হলো। ওকে দারুন ফ্রেস মনে হচ্ছে। হয়তো ঢাকার মেয়ে হবে। ঢাকার মেয়ের সাথে আমার আগে মেশা হয়নি। খুব বিধ্বস্ত লাগছিলো আমাকে। কমলাপুর স্টেশন থেকে উঠেছি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, এখন কোথায় কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা। সদ্য ঘুম থেকে জাগায় চোখমুখ ফোলা ফোলা, উসকো খুশকো চুল। চেহারাও সুন্দর নয় আমার। খুব হালকা পাতলা গড়নের তেইশ বছরের যুবক আমি। মেয়েটার থেকে চোখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। খুব দ্রুত ট্রেন ছুটছে বলে মনে হলো। আজ ট্রেনের শব্দও ভালো লাগছে না। এখন বৃষ্টি হলে ভালো লাগতো। আমি ট্রেন ভ্রমনে বেরুলে অনেকবার বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলা আমার ভালো লাগে। অনেকবারই বৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার মূল্য দেয়।

মেয়েটি বললো, স্যরি। আমার জন্যই ঘুম ভাংলো আপনার। ফোন অফ করে দিলো। ঢাকার মেয়েদের অন্যদের জন্য দূঃখ্যবোধ আছে এটা প্রথম দেখলাম। আমি বলাম, অফ করে আর কি হবে। আগেই সাইলেন্ট বা ভাইব্রেট করতে পারতেন। ও আবার বললো, স্যরি।

কিছু না মনে করলে একটা সিগারেট জ্বালাবো। ও সম্মতি দিলো। এখন আমরা কোথায় আছি বলতে পারেন? ও বললো , আমি ঠিক বলতে পারবো না। এ দিকটাই আজই প্রথম যাচ্ছি। তবে ঘন্টা খানেক আগে যমুনা সেতু পার হয়েছি। তাহলে এখনো সিরাজগঞ্জেই আছি। ও প্রশ্ন করলো, আপনি কি এ এলাকারই? মাথা নাড়ালাম। ও বললো, কোথায় যাবেন? আমি বললাম, বগুড়া। আমার কৌতুহল কম। তারপরও ওকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাবেন? ও বললো, জানি না। একদম অবাক না হয়ে আবার বললাম, কোথা থেকে আসছেন? মিরপুর থেকে। নিজের কাছেই মনে হলো কৌতুহলের মাত্রা অতিত্রম করছি। ইচ্ছে হচ্ছিলো শুনি কেন সে অজানার দিকে পা বাড়াচ্ছে। প্রশ্ন করলাম না আর। আপনি কৈ থেকে? বাংলাবাজার গিয়েছিলাম। লেখক নাকি? ওর প্রশ্নের মধ্যে আশ্চর্যভাব ফুটে উঠলো। আমি হাঁ- না কোনটাই বললাম না। ও বললো, আমি লেখক কবিদের পছন্দ করি না। আমি বললাম, জানি। কিভাবে জানলেন? আমি কোন কথা না বলে সিগারেট জ্বালালাম। ট্রেনের খাবার রুম থেকে দুকাপ চা দিয়ে গেল একজন। মেয়েটা একবার সিট থেকে উঠে গিয়েছিল। আমাকে চায়ের কথা

জিজ্ঞেসও করেনি। যাক চা পেয়ে ভালোই হলো। এক সাথে চা- সিগ্রেট আমার খুব প্রিয়। মেয়েটা বললো, আমরা কিন্তু কারো নাম জানিনা। আমি বললাম, সিদ্ধার্থ। ও বললো, ফারজানা।

ট্রেনের অভিমুখেই পাশাপাশি বসে আছি আমি আর ফারজানা। চেয়ার কোচ। একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়ছে পারজানা। প্রোব। একসময় খুব ইংরেজী শেখার তাগিদ দিচিছলেন স্যার। আমি

ইংরেজী তেমন জানিনা। কিছু কিছু বুঝতে পারলেও বলতে পারিনা। অবশ্য ইংরেজীতে ফেল করিনি কখনো। ইংরেজী ফোবিয়া আমার বরাবর। প্রোব ম্যাগাজিন সম্পর্কে পেশাগত দিক থেকেই আমার জানা বাধ্যতামূলক। জানালার পাশে বসে আছি আমি। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। মানুষের গতিও যদি এমন হতো। মানুষ অটোমেশন বানাচ্ছে অথচ অটোমেশনের কাছেই অসহায় হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিশোর বয়সে বেশ সায়েন্স ফিকশন পড়েছিলাম। এখন আগ্রহ বা ধৈর্য কোনটাই নাই। তারপরও বিজ্ঞান নিয়ে দু'একটা চমৎকার ভাবনা চলে আসে মাথায়। যেমন ৫০০ বছর পর আরো কতটা দখল করে নেবে বিজ্ঞান? তখন বিজ্ঞান কি কোন ক্ষমতা মানুষের জন্য অবশিষ্ঠ রাখবে ? আবোল তাবল সব উত্তর বের করার চেষ্টা করি। যা কোনভাবেই এই সময়ের সমসাময়িক নয়। আমার দূর্ভাগ্য আরো ৫০০ বছর পর আমার জন্ম হয়নি।

শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। এখন সমস্ত সন্ধ্যা। ফাল্গুন মাসে এমন একটি সন্ধ্যার জন্য মন হাহাকার করে উঠতো। আজ করছেনা। এখন অনেক কিছুর জন্যই আর বুকের মধ্যে হাহাকার করে না। অনেক কিছুর প্রতিই আমার আর কৌতুহল জন্মে না। আগে দুরে কোথাও মানুষ খুন হলে দেখতে যেতাম। এখন চোখের সামনে কেউ খুন হলেও দেখতে ইচ্ছে করে না। এই ইচ্ছে না করার জন্য আমি আশ্চর্যও হই না। এসব অনেক দেখেছি আমি। তবে এখনো একটা ক্ষেত্রে কৌতুহল আছে। নারী। কিশোরী, ষোড়শী, তরুণী, যুবতী- কোনটাই নয়, নারী। কোথায় যেন পড়েছিলাম, নারীর বয়স বত্রিশ বছর। পুরুষের বয়স নাই। ঠিক এই সময় রুমকির বয়স বত্রিশ বছর। ঘুম পাচ্ছে আমার। ঈশ্বরদী-সান্তাহার হয়ে বগুড়া পৌছাতে এখনো ঘন্টা তিনেক লাগবে। ঘুমানো যায়। ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে, এখন ঘুমিয়ে পড়লে এই সময়টাতে ফারজানাকে মিস করবো। ও কোথায় উঠে পাশে বসেছে জানি না। ঠিকানাহীন যাচ্ছে। আবার কোথাও হুট করে নেমে পড়তে পারে। ওকে মিস করতে চাচ্ছি না। নারী সঙ্গ ভাল লাগে আমার। এটা কোন নারী জানে না। এটা কোন নারীকে বুঝতে দেই না। স্বভাবসূলভ ভাবেই বুঝতে দিই না। নারী জানে আমি নারী বিদ্বেষী! কি অবোধইনা নারী। এটুকুও বুঝতে পারে না। এখন আমার মস্তিষ্কের দখল নিয়েছে ঘুম আর ফারজানা। যদিও ফারজানা এখনো নারী হয়নি। নারী হতে হতে বত্রিশ লাগে। অনেককেই দেখেছি বত্রিশে মহিলা হয়ে ওঠে। মা ছাড়া আর কোন মহিলাকেই আমার ভাল লাগে না। আমি পঞ্চাশ প্লাস এক নারী দেখেছি। যাকে আমার ভাল লাগে। অথচ পঞ্চাশে কতজনই না বৃদ্ধ হয়ে যায়। কি সব আবোল তাবল ভাবছি। অফিস থেকে ছুটি না নিয়েই সতের দিন ঢাকায় কাটিয়ে ফিরছি। এখনো চাকুরী আছে কি না, না ভেবে ফারজানাকে নিয়ে ভাবছি। ফারজানাকে ভাল লেগেছে আমার। ও নম্রও। সুন্দরীরা নম্র হয় না। বগুড়ায়ও কিছু মেয়ে চোখে পড়ে, যাদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে। তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করতে ইচ্ছে করে ওদের সৌন্দর্য, কিন্তু পেতে ইচ্ছে করে না। ফারজানাকে পেতেও ইচ্ছে করেছে। এখনই ওকে পেতে ইচ্ছে করছে। ওর সৌন্দর্য ছুঁতে ইচ্ছে করছে। ওর দিকে অসামান্য সময় তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। ক্লাস এইটে পড়তে প্রথম প্রেমের মতো এক ছায়াচিত্রের কবলে পড়েছিলাম আমি। ঐ মেয়েটার দিকে তিন ঘন্টার মতো তাকিয়ে ছিলাম। চোখ দিয়েই স্পর্শ করেছি ওর সব সৌন্দর্য। তারপর আর কারো দিকে তাকাতে পারিনি কিংবা কেউ আমর দিকে তাকায়নি। বিশ্রি চেহারা আমার। ফারজানাও হয়তো কথা বলেছে বাধ্য হয়ে।

ঘুম থেকে যখন জাগলাম, এ এলাকাকে আমার বেশ পরিচিত লাগছে। যদি ভুল না করি, আমি এখন বাঙালি নদীর উপর। হায় ঘুম আমার! বগুড়া ছেড়ে গাইবান্ধা চলে এসেছি। পাশে ফারজানা নাই। সিট খালি। এখন রাত ১০টার মতো হবে। ও হয়তো নাটোর কিংবা বগুড়ায় নেমে গেছে। একটা

সিগারেট জ্বালিয়ে ঠিক করলাম কোন এক সাংবাদিকের বাসায় থেকে যাবো রাতে। ফোন বের করে গাইবান্ধার আমাদের প্রতিনিধির নাম্বার খুঁজতেই দেখি ফারজানা হাজির। ও হাসছে। বললো, স্যরি। বুঝতে পারিনি বগুড়া ছেড়ে এসেছি। আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি বললাম, বুঝতে পারলে কি করতেন? ও বললো, জেগে দিতাম। -আমার ঘুম ভাঙাতে চাইছেন কেন? ও কোন কথা বললো না। আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর তাকানোর মধ্যেও একটা সৌন্দর্য পেলাম। আমি বললাম, গাইবান্ধা নেমে পড়বো আমি। এ এলাকা সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে চাইলে এখনই জেনে নিতে পারেন। ফারজানাকে বিচলিত দেখালো। এবারও কোন কথা বললো না।

ট্রেন স্টেশন পৌছানোর ক্ষণিক আগে ফারজানা বললো, আমিও নামবো। আমি ওর দিকে তাকালাম শুধু। এ মেয়েটাকে আমার স্বাভাবিক মনে হলো না। নেমে ওকে বাই বলে পা বাড়াতেই ফারজানা বললো, এমন কেন আপনি? - কেমন? -আপনি শুনেছেন আমি ঠিকানাবিহীন, তারপরও এই রাতে আমাকে ছেড়ে একা চলে যাচ্ছেন। -আমি কি করতে পারি? -অন্তত একটা হোটেলে তুলে দিয়ে যান। রিকশায় ও বললো, আজ আমার মন অনেক খারাপ। একটু সময় দেবেন আমাকে? - কিভাবে ? - আজ রাত আমার সাথে থাকবেন? -একটা পুরুষের সাথে থাকতে আপনার সমস্যা হবে না? -আপনি কি পুরুষ? বোধহয় চমকে উঠলাম আমি। এই প্রথম একটা মেয়ে এমন কথা বললো, শুনে কিছুটা অবাক হলাম। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, থাকবো। হোটেল স্কাই ভিউ'য়ে নামলাম। ডাবল একটা রুম নিল ফারজানা। আমি এই হোটেলে আগেও থেকেছি। গাইবান্ধা শহরের মধ্যে সেরা হোটেলটাই স্কাই ভিউ। বেলকনিতে বসে সিগারেট টানছি। ফারজানা ড্রেস চেঞ্জ করে পাশে এসে বসলো। পাশের রুমে একটা কিশোরী মেয়ের সাথে দুই যুবক ঢুকলো। ফারজানা তাদের লক্ষ্য করছিলো। ও সম্ভবত এমন দৃশ্য সরাসরি দেখেনি। দুজন ২৭/২৮ বছরের যুবকের সাথে ১৩/১৪ বছরের এক কিশোরী। ফারজানা আমাকে কিছু বলতে চেয়েও বললো না। ফারজানার সাথে এক বিছানায় রাত কাটাবো। এ রকম রাত কাটানো আমার জন্য নতুন নয়। নারীর সাথে অসংখ্য রাত আমি কাটিয়েছি। ফারজানা সবে তরুণী পার হওয়া যুবতী। আমি তরুণ। ফারজানাও কি এরকম রাত কাটানো নতুন নয়? ক্ষণিক পরিচয়ে একটা অপরিচিত ছেলের সাথে এক বিছানায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। রুম বুক করার সময় আমি দুটো সিঙ্গেল রুমের কথা বলতে পারতাম। বলিনি। আমি ফারজানাকে পেতে চাই। বিছানাও হয়তো ওকে পেতে চাইবো। যদি ওর সম্মতি থাকে, যদি সেও চায়, তাহলে আমার অসংখ্য রাতের মতো এ রাতও হয়তো কেটে যাবে। অবশ্য ফারজানা রিকশাতেই বলেছিল, আমি পুরুষ নয়। বয়সে ওর চেয়ে ছোট বলেই কি ও এমন কথা বলেছে? কোন বত্রিশাই কিন্তু আমাকে অ-পুরুষ বলেনি। অ-পুরুষ বলার কোন সুযোগও পায়নি কেউ। রুমকিও তো কখনোই বলেনি। ফারজানা কি বুঝে বলেছে?

কি সব ভাবছি। ঢাকায় সব টাকা শেষ করে ফেলেছি। অফিস থেকেও এ্যাডভান্স কম নেয়া হয়নি। নতুন ম্যানেজারটা বড্ড কড়া। হাজার টাকা এ্যাডভান্স চাইলে পাঁচশ'র বেশি অনুমোদন করে না। লেট করলে বেতন কাটে। মাসের বিশ দিনেরও বেতন পাই না আমি। সতের দিন পর চাকুরী আছে কি না, সেটাই জানি না। অফিস থেকে অনেকেই ফোন করেছিলেন। এমন কি সম্পাদকের ফোনও ধরিনি। বাড়ি ভাড়া, এ মাসের খরচ কিভাবে কাটবে এমন চিন্তা করাই উচিত হবে আমার। খাবার দিয়ে গেল হোটেলের এক বয়স্ক সার্ভিসম্যান। বললেন, চাচা, যদি আরো কিছু লাগে তো বলবেন, আমার কাছেই সব আছে। আমি বললাম, লাগলে বলবো। ফারজানা জানতে চাইলো, আর কি লাগতে পারে। আচমকা বললাম, সিগারেট। ও বললো, সিগারেট দিয়ে গেছে। একসাথে বসে খেলাম

দুজন। আমি স্বভাবত অর্ধেকটা খেয়ে পানি ঢাললাম। ফারজানা হোটেলের খাবার বলে অর্ধেকটা খেয়ে পানি ঢাললো। বাসায় রান্না করিনা আমি। হোটেলেই খাই। দীর্ঘদিন হোটেলে খাবার ফলে যে কোন খাবার বিষয়েই এখন আমি রুহিচীন। আর পাঁচটা ওষুধের সাথে প্রতিদিন- ওমিপ্রাজলও খেতে হয়। দু'মাস নিজেই রান্না করে খেয়েছিলাম। ধৈর্য হয়নি আর। মায়ের হাতের রান্না শেষ কবে খেয়েছিলাম মনে নেই। মায়ের সাথে ক'মাস আগে দেখা হয়েছিল, সেটাও মনে নেই।

রাত দুটো পেরিয়ে গেল। টিভিতে বার্সেলোনার ফুটবল দেখছি। ফারজানা অস্বস্তিবোধ করছে। ওকে জানালাম, ইচ্ছে করলে ঘুমাতে পারেন। ও বললো, তিন বছর ও রাতে ঘুমাই না। আমি জানালাম, আমি পাঁচ বছর। ফারজানা বললো, কিছু না মনে করলে সিগারেট জ্বালাবো। আমি বললাম, আপনাকে দেখে মনে হয়নি আপনি সিগারেট খান। তাছাড়া আপনার ঠোঁটও কোমল এবং যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ও জানালো, ও শুধু রাতে সিগারেট টানে। তাও পাইপে করে। আমি ওকে লাইটার এগিয়ে দিলাম। দুটো ব্যাগ ফারজানার। ছোট ব্যাগ থেকে মারবোলো ব্রান্ড বের করে পাইপে ভরিয়ে জ্বালালো। আমাকেও অফার করলো। আমি বললাম, আমার ব্র্যান্ড গোল্ডলিফ। লিওনেল মেসি মিড ফিল্ড থেকে সবাইকে কাটিয়ে এসে দারুণ এক গোল করলেন। ফারজানা মেসির এ গোলকে খুব ছোট সময়ে বিশ্লেষণ করলো। আমি এতোটা বিশ্লেষণ করে খেলা দেখি না। সিগারেট একটু বাকি থাকতে ফারজানা আবারো সিগারেট জ্বালালো। বললো, আমি শুনতে চাইলে বেশ কিছু কথা বলতে চায় ও। আমি বললাম, সকালের আলো ফুটলে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। টিভি অফ করলো ফারজানা। বার্সেলোনা এখনো এক গোলে পিছিয়ে আছে। ফারজানা বললো, তবু এই ম্যাচে বার্সেলোনাই জিতবে।

আমি শুয়ে আছি। ফারজানা আমার বাম পাশে কোলের উপর বাশিল টেনে হাটু গেড়ে বসলো। ফারজানাকে খুবই স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। আমি বুঝলাম, নারী হলে ও দারুন মতো দেখতে হবে। আমার দিকে গভীরভাবে তাকালো ফারজানা। আমি তাকাতে পারলাম না। আমি আমার বিশ্রি চেহারা দেখতে পেলাম। দাড়ি কাটলে আমাকে কিশোর বয়সী মনে হয়। সচরাচর সেভ করি না। এবার অনেকদিন দাড়ি কাটা হয়নি। ফারজানা বললো, আপনি চাইলে আমরা তুমি সম্বোধন করতে পারি। আমি বললাম, তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। ও হাসলো। আমি বললাম, তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে চাই। ও হাত এগিয়ে দিলো। আমি বললাম, থ্যাংকস। এবার শব্দ করে হাসলো ফারজানা। আমি সিগারেট জ্বালালাম।

ফারজানা বললো, আমি অতটা চর্চা না করলেও পৈত্রিক সূত্রে হিন্দু। বিবাহিত। আমার একটা ছ' বছরের মেয়েও আছে। আমি বললাম, জানি। ও বললো, কি করে জানেন? আমি বললাম, ঢাকার মেয়েরা পঁচিশের আগেই বিয়ে করে। কি নাম আপনার মেয়ের? -মিথি। খুব সুন্দর মেয়ে আমার। আমার চেয়েও। মিথির কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা নড়ে উঠলো। একটা কল্পনার মেয়ে আছে আমার। সুন্দর বাচ্চাদের দেখলেই মনে হয় আমি ওর বাবা। মেয়েকে খুব মিস করি আমি। -মিথিকে ছেড়ে চলে আসলেন, ও তো কষ্ট পাবে। -পাবে না। দু'বছর থেকে ও বাবার সাথেই থাকে। শেষ চার মাস আগে ওর স্কুলে একবার দেখে এসেছিলাম। আমার সাথে মিশতে চায় না মিথি। আমাকে ভয় পায়। আমারও তেমনভাবে মেশা হয়নি, তবু ওকে অনুভব করি। ও তো আমারই সত্ত্বা। মিথির বাবাকে ডিভোর্স করিনি। করবো। ভীষণ এক ট্রাজেডি ঘটলো আমার গত কয়েক বছরে। উচ্ছল মেয়ে ছিলাম। মোটামুটি ধনী ঘরেরই মেয়ে। পনের বছর বয়স থেকে আমার ব্যক্তিগত কারও আছে। বলতে গেলে বিলাসী মেয়েই আমি। বাবা মার অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিলাম ওকে। কাস্টমসের

অফিসার। বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিল এক কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। আমি ভালবাসার মূল্য দিলাম। হুট করে বিয়ে করলাম সবার অজান্তে। মিথি হবার এক বছর পর থেকে ওর সাথে আর হয়নি আমার। মাতালের সাথে ঘর করা যায় না। বাবার বাড়িতেই ফিরে আসলাম। তারপর থেকে বাবা আর কথা বলেননি আমার সাথে। শুধু টাকাই দিয়েছেন। লাইফটাকে বড্ড এক ঘেয়েমী মনে হলো। ওভাবে বাঁচা যায় না। এই তো, এখন এখানে। অনেক ক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে ফারজানা এগুলো বললো। আমি কোন কথা বললাম না। শুধু শুনলাম। ফারজানা সিগারেট জ্বালালো। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। চুলগুলোও কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে এর মধ্যে। আমি ওর চুলে হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম। ও আমার হাত স্পর্শ করলো। অবলম্বনের মতো শক্ত করে ধরতে চাইলে। আমি দ্রুত বেলকিনতে এসে সিগারেট জ্বালালাম।

সকালের আলো ফোটার আগেই আমি শুয়ে পড়লাম। আমার বাম পাশেই ফারজানা। দারুণ চুলের গন্ধ পাচ্ছি। আমি এ গন্ধ পাবার জন্য জোড়ে নিশ্বাস নিলাম। ফারজানার হাত আমার বুকের উপর রাখলো। আমি ঘুমে থাকার ভান করলাম। দুপুর দেড়টা বাজে, যখন ঘুম থেকে জাগলাম। ফারজানা এখনো ঘুমিয়ে। ফ্যানের বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে ওর চুল। গ্লাসের ভেতর দিয়ে আসা এক গুচ্ছ আলো ওকে ছুঁয়ে আছে। আমি অনেক ক্ষণ তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ওর সব কিছু দেখছি লোভীর মতন। ফারজানা চোখ খুললেই ওর সাথে চোখাচোখি হলো। কেমন ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, কি দেখছো? আমি বললাম, ঘুমন্ত নারীকে। ও বললো, আমি নারী নই। আমি বললাম, কেমন করে জানলে? ও বললো, যেমন করে জানি, তুমি অ-পুরুষ।

বিকেলে আমরা অনেক ক্ষণ রিকশা করে ঘুরলাম। লোকজন কেমন ওর দিকে তাকাচ্ছে। বাজে মন্ত ব্যও করলো কেউ কেউ। ফারজানা কিংবা ফারজানার ড্রেসআপ গাইবান্ধার জন্য নয় বুঝলাম। হোটেলে ফেরার সময় শুরু হলো বৃষ্টি। ফারজানা রিকশা ছাড়লো। বললো, এ টুকু পথ হেঁটেই যাবো। অনেকদিন ভিজিনা বৃষ্টিতে। আমারও লোভ হলো কোন যৌবনার সাথে মুক্ত স্নানে নামতে। দু'জনেই হাঁটছি। লোকগুলো রাস্তা ফাঁকা করে দিয়ে জড়ো হয়ে আছে এক একটি ছাপড়ার তলে। সবাই দেখছে আমাদের। কাপড় ভিজে ওর শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। ভাল করে তাকালেই দেখা যাবে, বৃষ্টি ভেজা এক সমস্ত বিকেলে মফস্বলের সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছে নগ্ন নারী। সাথে এক আনকোড়া পুরুষ। যদিও ও নারী নয়। যদিও আমি পুরুষ নই।

ফারজানাকে বললাম, কাল বগুড়ায় ফিরে যাবো। আমার অনেক কাজ। ও বললো, আমিও যাবো তোমার সাথে। থাকবো তোমার সাথে। অবশ্য যদি তুমি রাখতে চাও। -আধুনিক বগুড়ায় আমি সেকেলে একটা দু'রুমের বাড়িতে একা থাকি। তুমি কষ্ট করতে চাইলে থাকতে পারো, কিন্তু আমি উপার্জন করি সামান্য যা দিয়ে নিজেই তিন বেলা খেতে পারি না।

ফারজানা ব্যাগ খুলে বললো, সিদ্ধার্থ, দেখো এখানে অনেক টাকা আছে। তিন লাখেও বেশি। ক্রেডিট কার্ডও আছে। এ কার্ডে কম করে হলেও পাচ লাখ টাকা আছে। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই। আমি ফারজানার দিকে তাকালাম। ফারজানা কাঁধ ঝাকিয়ে উচ্চারণ করলো, হুম।

সন্ধ্যার মধ্যেই দুটো ঘর গুছিয়ে ফেললো ফারজানা। সাত বছর এর ঘর দুটো নিয়ে আছি। বছর তিনেক সাথে এক কলিগ ছিল। বিয়ে করে আলাদা থাকে এখন। আমিও মুক্ত হলাম। ভাড়া খুব বেশি নয়। চালাতে পারি। যে ঘরে ঘুমাতাম ওটা ফারজানাকে দিলাম। আমি নিলাম লেখার ঘরটাই। এ ঘরের জানালার সামনে তিনটে গাছ আছে। দেবদারু, কাগজী লেবু, পেয়ারা। টেবিলে বসলেই কেমন সুন্দর লেবু পাতার গন্ধ পাই। আমার ভাল লাগে। -এতো এলোমেলো কেন তুমি, ফারজানা বললো।

-আমাকে কেউ কখনো গুছিয়ে দেয়নি বলে। কেউ শিখিয়ে দেয়নি বলে। ম্যাগাজিন সাজাতে সাজাতে ও বললো, তোমার মা? আমি বললাম, আমি আমাকে আবিষ্কারের পর ভদ্রমহিলার সাথে খুব কম সাক্ষাত হয়েছে আমার। উনি শেষ কবে আমার থালায় ভাত তুলে দিয়েছেন সেটাও মনে করতে পারবো না। -উনি কোথায়? -জীবন চর্চা করছেন। হাসতে হাসতে বললো, বিয়ে করবে? আমি বললাম, পাশেই খাবার হোটেল, সাদা রুটি সাথে ডাল-সবজি হলে চলবে? ফারজানাকে সহজ বলে মনে হচ্ছে না। ঘরের উত্তর কোন থেকে ভদকার খালি বোতল কুড়িয়ে বললো, এসব কি? আমি বললাম, ভাত খেতে বাইরেই যেতে হবে। আমার গোল্ডলিফের প্যাকেট খুলে সিগারেট জ্বালালো ও। বেশ কিছুক্ষণ তাকালো আমার দিকে। টেবিলে বসে ক্রীড়ালোক দেখছি। লুঙ্গি পড়া। খালি গা। লিকলিকে শরীর।

অফিসে পৌছার ঘন্টা খানেক পরই ম্যানেজারের চিঠি পেলাম। শোকজ লেটার। উনিশ দিন না আসার শোকজ। সম্পাদকও অখুশি। ভদ্রলোকের খুশি অখুশি এক সময় দারুণভাবে আলোড়িত করতো আমাকে। এখন করে না। এখনো কাজে বসিনি। উনিশ দিনের পত্রিকাগুলো দেখছিলাম। সম্পাদকের ডাক পেলাম। ভদ্রলোক বললেন, কাজ করার ইচ্ছে থাকলে দায়িত্বশীল হও। নইলে আসতে পারো। আমি জানি এটাই তার শেষ কথা নয়। আমি বললাম, স্যরি স্যার। ভদ্র লোক কোন কথা বললেন না। কাজ করছেন। আমি বললাম উঠবো স্যার? উনি বললেন, সিগারেট দাও। আমি প্যাকেটের শেষ গোল্ডলিফটা বের করে দিলাম। দু'টান দিয়েই ফেরত দিলেন আমাকে। সিগারেট টানতে টানতে সম্পাদকের রুম থেকে বেরুচ্ছিলাম। ম্যানেজার ব্যাপারটা দেখে ডেকে বললেন, আমিই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। কোন কথা বললাম না। বুঝলাম আমার আর শোকজের উত্তর দিতে হচ্ছে না। বিকেল পাঁচটার দিকে দু প্যাকেট খাবার নিয়ে বাসায় ফিরে দেখি ফারজানা ঘুমাচ্ছে। চেয়ার টেনে ওর সামনে বসে থাকলাম অনেক ক্ষণ। ঘুমন্ত ফারজানাকে দেখলাম আমার কৈশরের প্রেমিকার মতো করে। ওর ঘুম ভাংলোনা তখনো। খেতে ইচ্ছে হলো না। খাবার প্যাকেটে চিরকুটে লিখলাম, অফিস শেষ হলে ফিরবো। খেয়ে নিও।

ত্রপা আমার সাথে কথা বলছেনা। গত উনিশ দিন একবারও ওর ফোন রিসিভ করিনি। ত্রপা আমার কলিগ। অফিসে কাজের বাইরে কথা বলি না। তবু অনেকেই জানে ত্রপার সাথে আমার আলাদা সম্পর্ক আছে। আমি মানিনি। শুরুর দিকে কয়েকদিন আমার বাসায় গোপন কিছু ঘন্টা কাটিয়েছিলাম আমরা। ত্রপাকে আমার ভাল লাগেনি। তবু রাত ভর ফোনে কথা বলতো হতো ওর সাথে। এ্যাকাউন্টিংয়ে তৃতীয় বর্ষ। সুন্দরী প্রেজেন্টেবল ত্রপা। ক্ল্যাসিক সুন্দরী। এইসব ক্ল্যাসিক সুন্দরীরা কি করে আমার প্রেমে পড়ে বুঝি না। বিশ্রি চেহারা আমার। তিনবেলা খাবার জোটে না। ত্রপাকে বললাম, তোমার জন্য একটা এক্সক্লুসিভ গিফট এনেছি। যদিও মিথ্যা বললাম। সচরাচর মিথ্যা বলি না আমি। ত্রপা বললো, দুপুরে খাওনি কেন? আমি বললাম, টাকা নাই। ত্রপা সিঙ্গারা আনিয়ে খাওয়ালো। যখন অফিস শেষ তখন রাত বারোটা। ফারজানার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ফেরার সময় পিওন একটা খাম দিলো। খুলে দেখি পাঁচটা চকচকে একশ' টাকার নোট। সাথে চিরকুটে লেখা, আমার সাথে এমন করো না। আমি কষ্ট পাই। এ মেয়েটার কাছে বোধহয় ঋণীই হচ্ছি আমি। ত্রপার টাকায় এক প্যাকেট গোল্ডলিফ, দশটা মারবোলো নিলাম ফারজানার জন্য। দু'প্যাকেট বিরিয়ানী নিলাম। অফিস থেকে বাসা পাঁচ মিনিটের পথ। জলেশ্বরীতলা বগুড়ার সবচেয়ে আধুনিক এলাকা। জলেশ্বরীতলার সবচেয়ে নিম্নমানের সেকেলে বাড়িটাই সম্ভবত আমার সাত বছরের বাসস্থান। বাড়িটার একটা নাম আছে, 'আশ্রম ফরটি ওয়ান'। নামটা দারুণ লাগে আমার।

বনমালীদেব লেনের আশ্রম ফরটিওয়ান আমার আশ্রম, আমার উদ্বাস্তু শিবির। প্রায় একটা বেজে গেছে। ফারজানা এখনো শুয়ে আছে। শরীরের উপর ছড়ানো কম্বল। বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। কপালে হাত দিয়ে দেখি জ্বর। ও জ্বরের সম্পর্কে কিছুই বললো না। বললো, একটা মহিলা এসেছিল সন্ধ্যায়। রুমকি নাম। রুমকির নাম শুনে চিন্তিত হলাম। ফারজানা কি প্রশ্ন করে কিছু জেনেছে। আমি বললাম, কিছু বলেছে? বললো যেতে বলেছে। আর কথা বাড়ালাম না। ওষুধ খাইয়ে দিলাম। সাধারণ ওষুধের মোটামুটি কালেকশন সব সময়ই থাকে আমার। বিশ্বাস করি, অন্তত দশটা অসুখ আছে আমার।

তিনদিন পর রুমকির ঘরে যেতেই হলো। গত তিনদিনই ফারজানার মুখে শুনতে হয়েছে ঐ মহিলাটি এসেছিল। ফারজানা গত রাতে প্রশ্ন করেছিল, মহিলাটি কে? আমি বললাম, এক অসহায়া। ফারজানা বাকা করে বললো, বেশ অসহায়াদের সেবা করতে পারো তুমি। আমি ওর চোখে তাকালাম। ও বললো, আমি তো এক অসাহায়া'ই। -বলছো? -হ্যাঁ বলছি। -আমি তাহলে কে? ও হেসে বললো, তুমি? তুমি তো তুমিই। আমি লিখছিলাম লুঙ্গি পড়ে। খালি গা। লিকলিকে শরীর। ফারজানা পুরনো ম্যাগাজিন ঘেটে আমার লেখাগুলো পড়ছে আর ওর মতো করে মন্তব্য করছে। আমি লিখা ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে শুনছি। ও একবার বললো, আমার দিকে এমন করে তাকাও কেন? কেমন করে তাকাই? -গভীর ভাবে। অমন গভীর করে তাকালে আমি ক্ষয়ে যাই। আমি বললাম, তোমার ক্ষয়ে যাওয়াটাকে উপভোগ করি আমি। ও বললো, নারী বিধ্বংসী তুমি। আমি বললাম, অ-পুরুষ আমি। ও হেসে বললো, যাহঃ! তোমার চোখে দশ সেকেন্ড তাকালে বিধ্বস্ত হবে নারী। আমি বললাম, একটা কিশোরী যে আমার প্রথম প্রেমিকা ছিল, সে তিন ঘন্টা তাকিয়েছিল আমার চোখে। ও বললো, তারপর? আমি বললাম, তার আর পর নাই। ফারজানাকে বললাম, তুমি বেশ সুন্দর। ও বললো, জানি। ত্রপা কয়েকবার ফোন করলো আমি রিসিভও করলাম না।

রুমকির ঘরে পৌছে দেখি, ও নাই। ফোন দিলাম। ও আধা ঘন্টা সময় নিলো। যখন ফিরলো বেশ বিধ্বস্ত লাগছিল। আমাকে এক প্যাকেট গোল্ডলিফ দিল। আমি নতুন প্যাকেটের সিগ্রেট জ্বালিয়ে বললাম, কেমন কামাচ্ছো? ও বললো, বারোশ চুক্তি ছিল, হাজার টাকা দিয়েছে। কলেজের তিন ছাত্র। চেয়ার টেনে খুব কাছে বসে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আর কখনোই আসবে না? আমি বললাম, এমন ভাবছো কেন? -মেয়েটা কি তোমার বউ? আমি হেসে বললাম, এক অসাহায়া। একটা দোতলা বাড়ির উপড় তলার এক সাইড ভাড়া করে থাকে রুমকি। রুমকি দক্ষিণের জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। আমি বললাম একটু জিরিয়ে নাও।

আমাকে অফিসে দেখেই সেলফোনে ম্যাসেজ দিলো ত্রপা। -আমার সাথে আর কথা বলবে না। ওর ডেস্কের সামনে বসলাম। মাথা নিচু করে টাইপ করছে। আমি বললাম, তোমার চুল থেকে সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি, কি শ্যাম্পু? ও একবার আমাকে দেখে আবার মাথা নিচু করলো। আমি বললাম, ছুটির এ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছি, আবার ঢাকা যেতে হবে। ভাল থেকো। উঠতেই হাত টেনে ধরলো ত্রপা। প্রথম প্রশ্ন, মেয়েটি কে? -কোন মেয়ে? রাত দুটোয় ফোন করেছিলাম। একটা মেয়ে রিসিভ করেছিল। ঐ মেয়ে। কাল একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফারজানা কি ত্রপার ফোন রিসিভ করেছিল? ত্রপাকে বললাম, মাথা ঠান্ডা করো। মেয়েটা ঢাকা থেকে এসে বিপদে পড়েছে। -তাহলে তোমার বাসায় কেন? বললাম তো, বিপদে পড়েছে। আমার হেল্প চায়। তাছাড়া সন্দেহের কিছু নেই। উনি আমার চে' কয়েক বছরের বড় হবেন। ত্রপা হাত চেপে বললো, অনেক ভালবাসি তোমাকে।

গত পনের দিনে আশ্রম ফরটিওয়ান নামের এই বাড়িটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একে আর আশ্রম ফরটিওয়ান বলে মনেই হয় না। দরজা-জানালা, ছাল ওঠা দেয়াল- সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু এ বাড়িতে নতুন করে এসেছে বিশাল টিভি, একটা ল্যাপটপ, ফ্রিজ। নতুন চেয়ার টেবিলের সাথে দুটো সিঙ্গেল খাটও এসেছে। দরজা জানালায় পর্দা উঠেছে। এখানে ওখানে ফুলের টব। একদম চেনাই যায় না বাড়িটাকে। ফারজানা শুধু বলেছিল, তুমি কিছু না মনে করলে আমি এ বাসাটাকে সাজাতে চাই নিজের মতো করে। কিছু না ভেবেই বলেছিলাম, সাজাও। আর কিছু বলিনি। কিন্তু এই পনের দিনে সাজাতে গিয়ে যে এত টাকা খরচ করে ফেলেছে, যা দেখে ভাবতেই হচ্ছে ফারজানা কি দীর্ঘদিন থাকতে চাচ্ছে এই শহরে? ও কি আর ফিরবেই না। স্বামীকেও ডিভোর্স দেয়নি। মিথির কথা ভেবেও তো ওর ফেরা উচিত ছিল। তাহলে এভাবে টাকা নষ্ট করছে কেন? এখন আর আগের মতো আমাকে খাবার বাইরে থেকে আনতে হয় না। ও রান্নাও করে। ফোন করে সময়মত খেতে আসবার তাগাদা দেয়। এর মধ্যে আমার এক কলিগ বাসায় এসেছিল। বাসার এই নতুন অবস্থা দেখে বলেছিল, দোস্ত, দারুণ একটা মাল পেয়েছিস। চালিয়ে যা। আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর বলা মাল শব্দটা ভেতরে ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ফারজানাকে কি ও নির্বোধ কোন এক বখে যাওয়া ধনীর দুলালী ভেবে মাল বলেছিল? বুঝিনি। ফারজানাকে আমার কখনোই নির্বোধ মনে হয়নি। আমি জানতাম সৌন্দর্য এবং মেধা প্যারালাল হয় না। কিন্তু ফারজানার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি যা জানি, ও তার কোন দিকেই কম নয়। আমার এক উপন্যাসের নায়িকা ছিল আসামের রমা। যে নায়কের টানে, নায়ককে পাল্টে দেবার জন্য বার বার আসতো বাংলাদেশে। বিচ্ছিন্ন জীবনজীবি নায়ককে রমা তার সাধ্যের সবকিছু দিয়ে বানিয়েছিল তুখোর এক সোসাইটি ম্যান। ফারজানা কি রমার মতোই কেউ? ফারজানা তো আমাকে পাল্টাতে চায় না। আমার কোনকিছুতেই ও না বলে না। তাহলে আমার সাথে থেকে এমন করছে কেন? বুঝে উঠতে পারছি না কিছু। ওর সাথে হিসেব করা দরকার।

মোটামুটি হালকা পোশাক পড়ে, শুয়ে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে ফারজানা। মনেই হয় না ওর বয়স সাতাশ/আটাশ। এই মুহূর্তে ফারজানাকে দেখে মনে হচ্ছে ও চিরযৌবনাই থাকবে। ন্যাচারাল এভারগ্রীণ। ফারজানা বললো, বসো। কিছু কথা বলবো তোমাকে, যদি মনে কিছু না করো তুমি। আমি জানালাম, আমি মনহীন এক অমানব। অ-পুরুষ। -এমন করে কথা বলো কেন তুমি, ফারজানা বললো। আমি বললাম, একটা মারবোলো দিবা। ও এগিয়ে দিলো প্যাকেট। নিজেও জ্বালালো। ফারজানা বললো, একাকী সারাদিন ভাল লাগে না আমার। তুমিও সময় দাও না। একটা চাকরী যোগার করে দেবে? -এই শহর তোমার দাম দিতে পারবে না, ফারজানাকে বললাম আমি। ও বললো, যতটুকু পাই। সিদ্ধার্থ, একটা ফ্ল্যাট দেখেছি। আমি ওখানে উঠতে চাই, যদি রাজি থাকো। আমার কোন মত নেই। সারহীন, ইচ্ছা বিহীন, মত বিহীন একজন মানুষ আমি, আমি বললাম। হাত চেপে ও বললো, আমি তোমাকে সহ উঠতে চাই। ফারজানার হাত বেশ শীতল। শুনেছি সাপের শরীর শীতল হয়। স্লামডগ মিলিওনিয়ারের রুবিনা নিকল কিডম্যানের সাথে এক বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করে কিডম্যান সম্পর্কে বলেছিল, অনেক সুন্দর কিডম্যান। ওকে ছুলেই ওর শরীরে নোংরা দাগ পড়তে পারে। ফারজানার সাথে আমার স্পর্শেও এমন মনে হচ্ছে। তোমার ফ্ল্যাটে যদি রুমকি আসে, সহ্য করবে তুমি, ফারজানার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। জানালা দিয়ে প্রচন্ড বৃষ্টি দেখতে পেলাম। আগে লক্ষ্য করিনি। -রুমকি তোমার কাছে আসে কেন, ফারজানা জানতে চাইলো। রুমকি আমাকে পুরুষ চর্চা করতে শেখায়, ধীর কণ্ঠে বললাম আমি। আমি তোমাকে ছায়া দেব,

ফারজানা প্রস্তাব দিল। আমি ফারজানার ঠোঁট স্পর্শ করলাম। ফারজানা বেড সুইসে লাইট অফ করলো। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল তখন।

সম্পাদককে ফারজানার অবস্থান বলে একটা চাকুরীর কথা বললাম। সম্পাদক রাজী হলেন। ফারজানা জয়েন করার তৃতীয় দিনে চাকুরী ছাড়লো ত্রপা। আমরা ফ্ল্যাটে উঠলাম। যখন আমার চতুর্থ বইটি বাজারে আসলো তখন ফারজানার সাথে এই ফ্ল্যাটে নয় মাস কেটে গেছে। হার্ট ও মাথা এক সাথে এ্যাটাক করেছিল আমাকে। ইসিজি রিপোর্টে ডাক্তার অসন্তোষের কথা জানালেন। হাসপাতালের কয়েকটা দিনই ফারজানা যথেষ্ট সময় দিয়েছিল। ফারজানা জানালো, আমার মা ফোন করেছিলেন, বাবার অবস্থা খারাপ। সে জানালো, বড় ছেলে হিসেবে সবকিছু ভুলে তার কাছে যাওয়া উচিত আমার। সন্ধ্যায় সিটি স্ক্যান করা হবে- নার্সের এই কথাগুলো শোনার আগে সম্ভবত ফারজানাকে বলেছিলাম, ঐ লোকটার সাথে আমার সম্পর্ক নাই। অনেক বছরই ছিল না। কোন কথা বলা হয়নি, এক এক করে অনেকেরই পরিচিত মুখ দেখলাম শুধু।

নতুন এক কেবিনে নিজেকে আবিষ্কার করে জানলাম আমি এখন ঢাকায়। ব্রেণের অপারেশন করা অনিবার্য হয়েছিল। ফারজানাই সব ব্যবস্থা করে ঢাকায় পাঠিয়েছে। ছয়দিন পর এসব কথা জানলাম আমার কলিগ শাওনের কাছ থেকে। শাওনকে ফারজানা আমার সাথে পাঠিয়েছিল। সপ্তাহ দু'য়েক পর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে বগুড়া ফিরে ফারজানার থেকে শুনলাম, বাবা মারা গেছেন। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম শেষ ক' বছর আগে লোকটাকে বাবা বলে সম্বধন করেছিলাম। এক সময় ভাল সম্পর্ক ছিল তার সাথে। সে তার অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছিল আমাকে। আমার বিদ্বেষ কাটেনি তবু। এ্যাডলফ হিটলারের লেখা 'আমি হিটলার বলছি' বইয়ে হিটলারের বাবার প্রতি বিদ্বেষের কারণ পড়েছিলাম। সম্ভবত আমার বাবা বিদ্বেষ মনোভাব ছিল এমনই। আবার মাথা ধরছে। চিৎ হয়ে শুলাম। ঘুমানোর আগে দেখলাম মা এসেছেন।

মোটামুটি সবকিছু স্বাভাবিক হতে চার মাসের মতো সময় লাগলো। আবার অমন দিন শুরু হলো আমার। শুরু হলো অমন রাত। ত্রপার মতো আর কারো সাথে সম্পর্ক হয়নি। রুমকির কাছে যাইনি আর। ফারজানা বৃত্তে আটকে গেলাম মাসের পর মাস। ফারজানা একদিন জানালো, ও অন্তঃসত্ত্বা। আমি বললাম তুমি চাইলে আমরা বিয়ে করতে পারি। ফারজানা বললো, ধর্ম সাপোর্ট করবে না। এমনিতেই তো বেশ আছি। আমি আর কোন কথা বললাম না। ফারজানার অনেক চেঞ্জ লক্ষ্য করছি। আগের মতোন চাঞ্চল্য নেই। সব কিছুকে অস্বীকার করে একটা একক সত্ত্বা হতে চেয়েছিল। এখন ও সবকিছুর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কেমন সংসারী ভাব। চাকুরি করে। বাজার করে। রান্না করে। ইন্টারনেটেও বসে না আর। সিগারেটও খায় না তেমন। বিয়ে করতে চাইলে ধর্মকে টানলো। এ্যাবরশনও করতে চাইলো না। আবার বুঝতে পারছি না ওকে। আমি এখনও ভদকা খাই। গোল্ডলিফ টানি। চাকুরী করি। লিখি। এখনো উদ্ভট চেহারা, বিচ্ছিন্ন দাড়ি গোফ। লিকলিকে শরীর। এক সাথে ঘুমাই। ঘুমাবার আগে জেগে উঠি। বুঝে উঠছি না সবমিলিয়ে কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের সম্পর্ক।

ক্লিনিকের ম্যানেজার আমার পরিচিত। ফারজানার কেয়ারে সর্বক্ষণ দু'জন নার্স রেখেছেন ভদ্রলোক। যতটুকু পারছি আমি ওর পাশে বসছি। তৃতীয় দিনে ক্লিনিকের ম্যানেজার ফোন করে জানালেন, ম্যাডাম বেশ উদ্বিগ্ন। আপনাকে পাশে চাচ্ছেন। আমি তখন প্রায় পৌছে গিয়েছিলাম গ্রামে। কয়েক বছর পর যাচ্ছিলাম। আর যাওয়া হলোনা। ফারাজানাই বলেছিল, তবুও তোমার একবার গ্রামে যাওয়া উচিত। তোমার মা ফোন করেছিলেন। আমার এখনো সময় হয়নি। তুমি ঘুরে আসতে পারো। মা

আমাকে আর ফোনও করেন না। কোন কিছু বলার থাকলে ফারজানাকেই জানায়। ফারজানাও ফোন করে প্রায় প্রতিদিন খবর নেয় আমার মায়ের। মা'র সাথে ওর বেশ ভালো সম্পর্কই তৈরী হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। যখন ক্লিনিকে পৌছলাম বুঝলাম ফারজানার চেয়ে নার্সরা বেশি খুজেছে আমাকে। আমাকে দেখে প্রায় দৌড়ে এসে একজন জানালো, ম্যাডামে অবস্থা খারাপ। পাগলের মতো খুঁজছে আপনাকে। ম্যানেজার জানালেন, সিজার করতে হবে। সবকিছুই রেডি আছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। ফারজানার বেডে বসে দেখলাম পদ্মপাতার মতো স্থির ওর মুখ। চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার গন্ধে চোখ খুললো ও। নার্সদের ইশারা করে রুমের বাইরে যেতে বললো। শক্ত করে হাত চেপে বলল, সিদ্ধার্থ, তোমাকে ভালবাসি। আমি ওর কপালে হাত বুলিয়ে বললাম, জানি। ও বললো, তোমাকে মিস করতে চাই না। বোধহয় বাঁচবো না আর। আমি ওর চোখে তাকিয়ে বললাম, ফারজানা এমন কথা বলছো কেন? ও চোখ বন্ধ করলো। বললো, মিথিকে স্বপ্নে দেখেছি। ও আমাকে শাপ দিয়েছে। বলেছে আমি মারা যাবো। শিশুর মতো শোনাচ্ছিলো ফারজানার কথাগুলো। কি বলবো বুঝতে পারছি না। ফারজানা কয়েক বছর মিথির থেকে বিচ্ছিন্ন। ফারজানা শাপ-এ বিশ্বাসী হবার কথা নয়। তাছাড়া মিথিরও শাপ দেবার মতো বয়স হয়নি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো ফারজানা, কি বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। ওর ঠোঁট কাঁপছে। নার্সকে ডাকলাম। নার্স বললো, সময় হয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে নিতে হবে।

দু' ঘন্টা পর খবর পেলাম কন্যা সন্তান হয়েছে ফারজানার। এখনো জ্ঞান ফিরেনি ওর। এতোটা উদ্বিগ্ন বোধহয় আর কখনো হইনি। ফারজানার জ্ঞান ফিরছেনা কেন, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম। ডাক্তার বললেন, ফিরবে। নার্স বললো, আপনার মেয়েকে দেখবেন। আমার মেয়ে শব্দটা আলোড়িত হতে থাকলো আমার বুকে।

অনেক আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম আমার ছেলের নাম হবে শৈশব, মেয়ে তিতলী। এ দুটো আমার পছন্দের নাম। ওরা বড় হয়ে ইচ্ছে করলে নিজের নাম পরিবর্তন করতে পারবে। আমি আমার নাম নিজেই রেখেছিলাম। ফারজানা দ্বিমত করলো না। মেয়ের নাম তিতলীই রাখা হলো। তিতলীকে বেশি সময় দিতে পারি না। ফারজানাই যথেষ্ট সময় দেয়। তবু তিতলীর যখন পাঁচ মাস বয়স তখন থেকেই মেয়েটা একটা এক্সটা ভাব তৈরি করেছে আমার সাথে। তিতলী শুদ্ধভাবে প্রথম যে শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছিল তা হলো, 'বাবা'। আমার সাথে তিতলীর সম্পর্ক সম্ভবত ফারজানার সাথে তিতলীর সম্পর্কের চেয়ে গাঢ় হয়ে উঠলো। তিতলীর দেড় বছর বয়সে ফারজানা আবার চাকুরীতে জয়েন করলো। তিতলীকে দেখাশুনা করার জন্য একটা মেয়ে রাখলো। আমি কখনোই সংসার বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে ভিড়িনি। ভিড়তে চাইনি কিংবা পারিনি।

তিন বছর বয়সে এসে তিতলী বুঝলো আমি ওকে শুধু ভালবাসাই দিচ্ছি। ফারজানা দিচ্ছে ভালবাসা প্লাস তিতলীর তিতলীময় একটা অত্যাধুনিক পৃথিবী। ফারজানার সাথে মিশে গেল তিতলী। দারুণ সম্পর্ক ওদের। দারুণ বোঝাপড়া। ফারজানাও তিতলীকে ভালবেসে ফেলেছিল গভীরভাবে। ওর জন্য আবার চাকুরী ছাড়লো। চব্বিশ ঘন্টা গড়ে উঠলো মা মেয়ের সম্পর্ক। সবে নারী হয়ে উঠছে ফারজানা, সেই সাথে হয়ে উঠলো কৃপণও। তিতলীকে ছাড়া যেন কিছুই বোঝে না। তিতলীও ফারজানাকে ছাড়া কিছু বোঝে না।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম ফারজানা ও তিতলীর থেকে। সারাদিনে দু'এক বার কথা হয় আমার তিতলীর সাথে। দুপুর বারোটার যখন ঘুম থেকে জাগি কেবল তখন দেখা হয়। ও ইচ্ছা হলে দু'একটা কথা বলে। জানুয়ারীতে তিতলীকে শহরের সবচে নামী কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করাবে, ফারজানা বললো।

এখন ওর বয়স চার। মায়ের কাছে থেকে শিখে ফেলেছে অনেক কিছু। বাংলার চেয়ে ইংরেজীতেই বেশি দখল।

ইত্তেফাকে ফারজানার ছবি দেখে চমকে উঠলাম। ফারজানার বাবা ফারজানা খোঁজ চেয়ে ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ফারজানা বলেছিল নিজের ইচ্ছেয় বিয়ের পর থেকে বাবা ওর সাথে কথা বলেননি। কাল তিতলীর জীবনের প্রথম এ্যাডমিশন। ফারজানা দাবী করেছিলো, মা মেয়ের সাথে আমাকেও যেতে হবে স্কুলে। আমি অফিস থেকে ছুটি নিলাম। বাসায় পৌছাতেই ফারজানা জানতে চাইলো, আমি ছুটি নিয়েছি কি না। সকাল ন'টায় পৌছাতে হবে স্কুলে। আমার হাত ধরে ওর রুমে নিয়ে গেল। দেখালো কাল তিতলীকে যে নতুন পোশাকগুলো পড়ানো হবে- ওগুলো। তিনটে স্কুল ব্যাগ কিনেছে। জানতে চাইলো কোনটি আমার পছন্দ। আমি ফারজানাকে ইত্তেফাকের বিজ্ঞাপনটি দেখালাম। ফারজানা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। প্রথমে চোখ দিয়ে পানি পড়লো। পরে শব্দ করে কাঁদলো। আমি প্রথম ফারজানার কান্না শুনলাম। তিতলী ঘুমিয়ে। ঘড়িতে সকাল আটটার এ্যালার্ম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগেও ফারজানার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ঘড়িতে এ্যালার্ম বাজলে ঘুম থেকে জাগলাম। তখন সকাল আটটা। এ্যালার্ম বন্ধ করতে যেয়ে চমকে উঠলাম। বলা যেতে পারে আঁতকে উঠলাম, ফারজানার পাঁচ লাইনে লিখা একাট চিরকুট দেখে। তাড়াহুড়া করে তিতলীর কাছে যেয়ে দেখি ও বই উল্টাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, বাবা আম্মু কোথায়? আমি বললাম, বাইরে গেছে। চলো বাবা রেডি হয়ে নাও। আজ তোমার প্রথম স্কুল। ও বললো, আম্মু আসালেই তো রেডি হবো। কেমন ছোট ছোট কথা তিতলীর। সাড়ে আটটার মধ্যে নতুন পোশাক পড়িয়ে রেডি করলাম। ও শুধু আম্মুকেই খুঁজছে। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি নিজেকে সামলে বললাম, চলো বাবা স্কুলে যাই। ও বার বার এক কথাই বললো, আম্মু আসলে যাবো। আর সামলাতে পারিনি নিজেকে। তিতলীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, বাবা, আম্মু আর আসবে না।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....ছোটগল্প.....

আক্রোশ এবং অবশিষ্ট

অংশু মোস্তাফিজ

এখানে একটা পাকুড়ের গাছ ছিল। শতবর্ষী। শতবর্ষী বলা সংগত হবেনা। আমার পিতামহ, যাকে আমারা দাদা বলে ডাকতাম, তিনিও বলেছিলেন, তার জন্মের পর গাছটিকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছিলেন। দাদা মারা গেছেন ষাট বছর হয়। যখন জেলে যাই তখনো গাছটি দেখেছি। এখন নাই কেন? কেউ কি কেটে ফেলেছে? অন্তত এই শতকেও এ পাকুড়ের মারা যাবার কথা নয়। আমি কি রাস্তা ভুল

করছি? না। তা কেন, এইতো শ্যামলীর মোড়। জোড়া দীঘি। তাহলে? যাহোক, সে কারো থেকে জেনে নেয়া যাবে।

ঘুম থেকে জেগে দেখি সন্ধ্যা আসন্ন। বাড়ি ভর্তি লোক। এই লোকগুলোর অনেককেই আমি চিনিনা। সম্ভবত আমাকেও সকলে নয়। যখন ঘর থেকে বেরোলাম, উঠানটা এক মূহুর্ত্বে চুপ করে গেল। এক গ্রাম মানুষ উঠানে, কেউ কোন কথা বলছে না। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করলো না। ঘরে ফিরতে চাচ্ছিলাম। টুলু চাচার মুখ দেখতে পেলাম। মুমূর্ষু অবস্থা। কাছে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন চাচা? চাচা বললেন, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না? তুমি এতো করলে, আমরা তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। টুলু চাচা কেঁদে ফেললেন। বললেন, সবাই মারা গেছে বাবা। তোমার বাবাকেও আটকাতে পারিনি। আয়ুব, লতিফ শহরে থাকে। আর কেউ নেই। যাদের দেখছো, তোমাকে এরা চেনেনা। তোমার সব ঘটনা জানে। তোমাকে দেবতা মানে। এদের কিছু বলো। মহিলারা আঁচলে চোখ মুছছেন। শব্দ করে কেঁদে ফেললো একজন। আমি কি বলতাম, কিছু বুঝে উঠিনি। বললাম, শ্যামলীর মোড়ের পাকুর গাছটি কোথায় চাচা? চাচা বললেন, সে দশ বছর আগে কেটেছে সরকারের লোক। পাকা সড়ক বানিয়েছে। আরো কত কি, তুমি এসব জানো না। চাচাকে বলতে ইচ্ছে হলো, আমি এসব জানি। জেলে বসে খবরের কাগজে সব পড়েছি। কিন্তু মেলাতে পারছি না। দেশের কি এমন পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারছি না। শ্যামলীর মোড়ের পাকুড় গাছ কেটে পাকা সড়ক বানালেই পরিবর্তন হয়ে গেল। সড়কইবা পাকা কোথায়, পীচের ছাল বাকল উঠে এখানে ওখানে গর্ত দেখলাম। টুলু চাচা কি একটা বলতে চাচ্ছিলেন, মা থামিয়ে দিলেন। মা বললেন, তোমরা এখন যাও। বাদলকে খেতে দেব। এক মহিলা, মায়ের বয়সী আমি ঠিক চিনতে পারলাম না, বললেন, এতোদিন পর ছেলে দেশে ফিরলো, কি দিয়ে খেতে দেবে? মা কোন কথা বললেন না।

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। অনেকদির পর। অনেকবছর পরও বলা যায়। আগের বাড়িটাই আছে। বাড়ি বলতে এখনো একটা ঘর। বাশের বেড়া। পলিথিনের ছাউনি। এখানে ওখানে ছেড়া। খুব সকালে চোখে আলো লাগলে ঘুম ভাংলো আমার। এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালাম। এই আমার গ্রাম। সবই চেনা। অচেনা মুখ। দু'চারটা ইট সিমেন্টের বাড়ি ছাড়া গ্রামের অবস্থা বলতে যা দেখে গেছি, এখনো তাই। চৌধুরী বাড়ির সামনে এসে হাসি পেয়েছিল আমার। ঝলসানো চৌধুরী বাড়ি। ঝোপঝাড়, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে কলজে রং ইটের দেয়ালগুলো। এইসব ইট আমার চেনা। বাড়ি ছেড়ে চৌধুরীরা কবে চলে গেছে জানা হয়নি। বাড়ি ফিরে যেতে যেতে কাল রাতের কথা মনে পড়লো। তক্তপোসে আমার বিছানা পেতে দেয়া হয়েছিল। মা শুলেন মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। শোবার কিছুক্ষণ পর দ্রুত রাত গভীর হলো। মা কাঁদছিলেন। আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। কিছু বলা উচিত কিনা বুঝতেও পারছিলাম না। মা বললেন, তুই ফিরে এলি কেন? গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে, ডাকাত বাদল ফিরে এসেছে। মা'র থেকে জানলাম, গ্রামের এই প্রজন্ম আমাকে ডাকাত বলে জানে। সত্যি বলতে কি, ওদের ভুল জানানো হয়েছে। আমি ডাকাত ছিলাম না।

তুমি জাহানারার ছেলে বলে তোমাকে কথাগুলো বলছি। সত্যি বলতে কি কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে। কি যেন তোমাদের কাগজের নাম? সে যাক, তোমার মা কেমন আছে? ভাল না থাকার কথা নয়। জেলে বসে শুনেছি, ওর ভাল জায়গায় বিয়ে হয়েছে। ভাল লেগেছে শুনে। আমি আর কি দিতে পারতাম বলো, একটা আক্রোশে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। তুমি যেটাকে মহান বলে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছো, তাকে মানুষ নষ্টতা বলছে, মা'র থেকে শুনলামইতো লোকজন আমাকে ডাকাত বলে জানে। আমি কিন্তু ডাকাতি করিনি কিংবা অমন ইচ্ছেও ছিল না। গতপরশু জেলার সাহেব ডেকে একটা চিঠি

দিয়ে বললেন, ঈদ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ইচ্ছেয় তোমার সাজা কমিয়ে তোমাকে মুক্ত করা হলো। তুমি ফিরে যাও। ভাল থেকো। একটা চিঠি হাতে ধরিয়ে দিয়ে উনি চোখ মুছলেন। ভদ্রলোক বেশ ভাল মানুষ। তার নাতিকে আমি পড়াতাম। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুকম্পার চিঠিতেও উল্লেখ ছিলো, তিনটে ধর্ষণ আর দুটো হত্যা মামলা থেকে আমাকে মুক্ত করা হলো। সাজা ছিল ৩২ বছর। অনুকম্পা করে করে ২৫ বছরে মুক্তি দিয়েছে। মুক্তি পাওয়া কিংবা না পাওয়াতে আমার কোন বোধ ছিল না। জেলে মন্দ ছিলাম না। কৈ আমারতো কোন অবদমন নেই। আমি ভাল ছিলাম।

তোমার কাছে সিগ্রেট হবে? দাও দাও। জাহানারার ছেলে হয়েছো তো কি হয়েছে। তুমি চাইলে নিজেও একটা জ্বালাতে পারো। আমার সামনে টানতে আপত্তি করবার কোন কারন নাই। হ্যা, শুরু থেকেই বলি তাহলে। আর শোন, এ সব খবরের কাগজে লিখো না। এভাবে কোন বিপ্লব সফল হবে না। এটা ছিল আমার এক্সট্রা একটা আক্রোশ মাত্র। মানুষ, অন্তত সেই সময়ের মানুষ অত্যাচার সইতেই অভ্যস্ত ছিল। ওরা বিপ্লব কিংবা প্রতিবাদ কোনটাই চায়নি। চাইলে আজ আমাকে ডাকাত শুনতে হতো না।

আমি তখন মাট্রিক দেবো। বাবা চৌধুরী বাড়িতে কাজ করতেন। জমিজমা দেখাশোনার কাজ। জহুরুল চৌধুরী দশ গ্রামের মাথা। তার কথায় চলতো সবাই। গ্রামের সব সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন। বাবার কাজের সুবাদে আমি চৌধুরি বাড়ি যেতাম। চৌধুরীকে গ্রামের সবাই ভয় করে চলতো। ব্রিটিশ আমলের জমিদারের বংশধর জহুরুল চৌধুরি। তার চালচলনও ছিল ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারী জমিদারের মতোই। বাবার খোঁজে চৌধুরি বাড়ি গিয়ে একদিন ভর দুপুরে চৌধুরির ঘর থেকে একটা মেয়ের কান্না শুনতে পেলাম। গলা পরিচিত। ও বাড়ির কেউ নয়। আমি ওদের সবাইকে চিনতাম। কান্নার শব্দ আমার বেশ পরিচিত লাগলো। দড়জার ফাঁক দিয়ে দেখি আমার খুব পরিচিত পাড়ারই একজন মেয়েকে চৌধুরি জোর করে ধর্ষণ করছেন। নাম বলছি না, তুমি তাকে চিনতেও পারো। আমি কি করবো ভেবে পেলাম না। দৌড়ে বাইরে এলাম বাবাকে বলবো ভেবে। বাইরে বেড়িয়ে দেখি মেয়েটির বাবা দড়জার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আর বাবার কাছে গেলাম না। একটু দুর থেকে দেখলাম, ক্ষনিক পরে মেয়েটি ফিরে এলে তার বাবা তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে গেলো। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। ভাবলাম, আমাদের আড়ালে ও শরীর বিক্রি করা কোন মেয়ে হবে। কিন্তু না। কিছুদিন পর জানলাম, চৌধুরির জমি চাষ করে খাবার বিনিময়ে লোকটি তার মেয়েকে চৌধুরির কাছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি। লক্ষ্য রাখছিলাম, চৌধুরি বাড়ির দিকে। সাত দিনেই অন্তত সাতটি মেয়ে কিংবা কারো বউকে চৌধুরির অপকর্মের শিকার হতে দেখেছি। আমি কিছু করতে পারিনি। বাবাকেও বলতে পারিনি। একদিন দেখলাম, কি এক কাজে ব্যর্থ হওয়ায় চৌধুরি বাবাকে পেটাচ্ছেন। আক্রোশে ফেটে পড়েছিলাম। কিন্তু চৌধুরির সামনে শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার মতো আমার কোন অবলম্বন ছিল না। প্রতিশোধের ইচ্ছায় পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

পরদিন দুপুরে জোড়া দীঘির পারে দুলালের সাথে দেখা। দুলাল চৌধুরির মেঝ ছেলে। আমার সাথেই পড়তো। অনেকটা বোকা টাইপের। আমি ওকে দীঘিতে গোসল করার জন্য নিয়ে পানিতে চেপে ধরেছিলাম। দুলাল বাঁচার জন্য ছটফট করছিল। ওর ছটফট দেখতে ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়েছিল, যে মেয়েটি বাবার বয়সী চৌধুরির হাত থেকে বাচতে ছটফট করছিল। কিন্তু চৌধুরি কি অমানবিকভাবে মেয়েটির বারন উপভোগ করছিলো। দুলাল মারা গেল। সবাই ভাবলো দীঘিতে দোষ

আছে। জীনপরী দুলালকে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে। দুলালের মৃত্যুতে চৌধুরির কোন বোধদয় হয়নি। চৌধুরির অবস্থান আগের মতোই ছিল। দাও আরেকটা সিগ্রেট দাও। এক কাপ চা হলে ভাল হতো। সেতুর কথা দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে পারি। সেতু চৌধুরীর দ্বিতীয় মেয়ে। আমার সাথেই পড়তো। দুলাল আর সেতু- দু'জনারই বেশ ভাব ছিল আমার সাথে। দুলালকে মারার পর আমার তেমন আপসোস হয়নি। প্রথম কয়েকটা দিন বিষন্ন ছিলাম। এটা তো কোন সমাধান নয়। বিপ্লব বলতে যা জানতাম তার কোন অংশও নয়। তাহলে কি করলাম আমি? যাক, যা হবার হয়ে গেছে। মাস খানেকের মধ্যে আবারো আক্রোশে জেগে উঠলাম। সেতুর সাথে আমার সম্পর্ক করতে সময় লাগেনি। একটা হৃদয়বৃত্তিক টান আগে থেকেই ছিল। তার সাথে যোগ করলাম আমার প্ল্যান। ব্যাস, আমি সফল মিশনের দিকে এগোলাম। এক দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে পাটক্ষেতে সেতুকে আমি ধর্ষণ করলাম। কি হে, তুমি কি লজ্জা পাচ্ছো শুনে? আমাদের সময়েও আমরা এসব আলোচনায় লজ্জা পেতাম না। এখন নাকি তোমাদের সময় অনেক এগিয়েছে। ভাবছো, আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়, তাই। তো কি হয়েছে, শেয়ারিং কিংবা বন্ধুত্বে বয়স কোন ফ্যাক্টার নয়। তোমার মা আমার খুব ভাল বন্ধুও ছিল। তোমাকে হয়তো বলেনি কিছু। খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল জাহানারা। সেতু খুব আপত্তি করেছিল। বলেছিল, জোর করলে ওর বাবাকে বলে দেবে। আমি কোন ভয় পাইনি। গাঁয়ের মেয়েদের ওর বাবার নষ্ট করার ঘটনাগুলো আমার প্রবল আক্রোশ হয়ে সেতুর উপর নির্বান করেছিলাম। যেমনি নির্বান করেছিলাম দুলালের উপর। আমাদের তখন সতের বছর। সেতু কাউকে বলেনি। তবে আমার সঙ্গে আর সেভাবে মেশেনি। আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। আমার প্ল্যান ছিল ওকে অন্তত একবার ধর্ষন করে ওর বাবার প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার। আমি নিয়েছি। সেতুর ছোট বোন যুথি। বারো কি তের হবে তখন। এখন তাহলে কত হয়েছে? তুমি কি জানো ওরা এখন কোথায় থাকে? চেষ্টা করো তো। একবার দেখবো ওদের। আমার পঁচিশ বছরের জেলজীবন স্বার্থক করা দরকার। আমার বিভৎস্য অবয়ব দেখে ওদের ভেতরে আবারো নতুন করে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার বিনিময় পঁচিশ বছরের জেলজীবন। আমি কোনভাবেই আর আশা কিংবা হতাশাবাদী নই। যুথিকে ধর্ষণ করতে আমার অনেক সময় কাটাতে হয়েছে। শুধু যুথিকে ধর্ষণ করাই শেষ উদ্দেশ্য হলে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। আমার আরো কাজ বাকি ছিল। ভয় ছিল যুথি তো সেতুর মতো নয়, যদি চৌধূরীকে বলে দেয় তাহলে আমার সব প্ল্যান শেষ। যাক, কোন অদৃশ্য আর্শিবাদ আমাকে মুক্ত করতে পেরেছিল সব সঙ্কা থেকে। বলতে হয়, লাভবানই হয়েছিলাম। একদিন যুথিকে ছেড়ে বেড়িয়েছি এমন সময় সেতু সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, তোমার সব বুঝে গেছি। আমার সাথে যা করেছো, প্লিজ ছোট বোনটাকে এভাবে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ো না। আমি সেদিন হেসেছিলাম। শুধু কষ্ট ছিল, সেতুকে বলতে পারিনি, সেতু, আমি চরিত্রহীন নই। আমি কোন অন্যায় করছি না। তোমার বাবার প্রতি প্রতিশোধ নিতে তোমার প্রতি আমার যে টুকু নষ্টামি। নষ্টামি তোমার বোনের প্রতি। পরের দিন যখন সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছিলাম, আমি আর এ পথে এগুবো কি না। ঠিক তখন পেয়ে গেলাম আরেকটি সুযোগ। সবে রাত শুরু হয়েছে। কৃষ্ণকাল। চৌধুরীর বাবা কোথাও থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আশেপাশে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ তার পিছুপিছু হেটে শ্যামলীর মোড়ে তার কাছাকাছি চলে এলাম। উনি আমাকে দেখে ধমকে উঠলেন। কেন ধমকে উঠেছিলেন আজ এতোদিন পর মনে নেই। আমি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। অন্য দিকে চলে গেলাম। শেখর চৌধুরী আবারো হাটতে থাকলেন। খুব সঙ্গোপনে পিছু এসে তার মাথায় একটা কাঠের গুড়ি দিয়ে আঘাত করলাম। খুব কম সময়ের জন্য বিকট একটা শব্দ করে শেখর চৌধুরী মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি

আর দেরি করিনি। অন্য কোন লোক আসার আগেই বাড়ি এসে ঘুমিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি সেই দিনগুলোতে ঘুমোতে পারতাম না। আমি কি করছি, এমন একটা অস্থির চিন্তাধারা আমাকে পাগল করে রাখতো। সত্যি বলতে কি, আমি এখনো ঘুমোতে পারি না। স্মৃতি এবং বিস্মৃতি এখনো আমাকে পোড়ায়। সেই সময়টা আশেপাশের দশগ্রামে তোলপার করা ঘটনা ছিল চৌধুরী পরিবারের ঘটনাগুলো। চৌধুরীর ছেলে খুন হবার কয়েকদিন পর বাবা খুন। মানুষ সারাদিন আলোচনা করতো এই বিষয়গুলো। তখনো কেউ সরাসরি বলতে পারতো না, যে সে খুশি হয়েছে। কিন্তু বোঝা যেত, প্রতিশোধ পরায়ন মানুষগুলো বেশ খুশি হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসনের চোখে ঘুম ছিল না। কারা এই সব ঘটনা ঘটাতে পারে, সেই তথ্য বের করার জন্য পুলিশ অসংখ্য মানুষকে আটক করেছিল। জেরার নামে পিটিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছে। এ তালিকা থেকে বাদ যায়নি আমার বাবাও। চৌধুরী বাড়ির কর্মচারী হিসেবে পুলিশ বাবাকে গাঢ় ভাবে সন্দেহ করেছিল। তাই বাবাকে সহ্য করতে হয়েছিল অকথ্যসব অত্যাচার। জেলে একবার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার চোখের জলে যে ছবি দেখেছি তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, চৌধুরীর সব অত্যাচারের সালতামামী। বাবা কোন কথা বলেনি। সে বলেওনি সে নির্দোষ। শুধু বলেছিল, তোর সামনে অনেক পথ। দেখেশুনে চলিস। বাবা বোধহয় ধরেই নিয়েছিল সে আর বেরুতে পারবে না। কিন্তু কেবল আমি জানতাম, শিঘ্রয় বাবা জেল থেকে বেরুবে। জেলে থাকবো আমি। যেদিন সবার সামনে চৌধুরীকে খুন করবো, ঠিক সেদিন আমি হাসতে হাসতে ঢুকবো জেলে, বাবা বিষন্ন মুখে বেড়িয়ে আসবে জেল থেকে। তারপর আশ্চর্য হয়ে একদিন চৌদ্দ শিকের মধ্যে দিয়ে তাকাবে আমার দিকে। আমিও বাবাকে কোন কথা বলবো না। বলবো না, বাবা আমি দোষী কি নির্দোষ। আমি কেন খুন করেছি। কেন ধর্ষণ করেছি।

পরীক্ষা হয়ে গেল। মাট্রিক। গ্রাম থেকে আমরা দু'জন পরীক্ষর্থী। আমি আর জাহানারা। কোন মতে পারীক্ষা শেষ করেছি। একের পর এক খুন ধর্ষণ করে পরীক্ষার হলে লিখা খুব সহজ কথা নয়। তোমর কি যেন নাম, ভুলে যাই সবকিছু। যাক, পরীক্ষা শেষ করে একদিন বাবার জামিনের কথা বললার ছল করে চৌধুরী বাড়ি গেলাম। মতলব ছিল চৌধুরীকে খুন করবার স্পট প্ল্যান তৈরী। হলো না। খুব ভয়ে ভয়ে চৌধুরী বাড়িতে ঢুকলাম। দোতালায় উঠলাম। কাউকে চোখে পড়লো না। উত্তরের ঘরে গিয়ে দেখি সম্পা আপা ঘুমোচ্ছেন। সম্পা চৌধুরীর বড় মেয়ে। আমার চেয়ে অন্তত আট বছরের বড় হবেন। আমার জিদ চাপলো। দড়জা আটকিয়ে উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম সম্পা আপার উপর। গায়ে গতরে প্রবল শক্তি ছিল তখন। গ্রামের কেউ মারামারিতে আমার সাথে লাগতে চাইতো না। আমি ধর্ষণ করলাম। সম্পা আপার চিৎকারে দড়জায় এসে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক। দড়জা ভাংগার চেষ্টার শব্দ শুনলাম। আমি আমার আক্রোশ শেষ করে দড়জা খুললাম।

জেলে এক সপ্তাহের মত প্রচন্ড পিটিয়েছে আমাকে। আমি অকপটে সব স্বীকার করেছি। কেন এই সব করেছি তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। কোন কথায় শোনেনি। ইচ্ছে মত পিটিয়েছে। ওদের ধারণা কিংবা ইচ্ছে আমাকে ডাকাত হিসেবে প্রমান করা। শেষ পর্যন্ত আমি আমাতে অটল থাকতে পেরেছিলাম।

সেদিন চূড়ান্ত রায় হবে। গ্রামসুদ্ধ লোক এসেছে আদালতে। সবার মুখ বিষন্ন। আমি এজলাসে দাঁড়ালাম। জজ সাহেবের এক প্রশ্নের উত্তরে বললাম কেন সম্পাকে ধর্ষণ করেছি। যে অবশিষ্ঠ কথা পুলিশ- আদালত- বাবা কিংবা গ্রামের লোক জানে না, সেই কথাগুলোও বলে দিলাম অকপটে। আমি খুব নির্ভিকচিত্তে বলে দিলাম, শুধু সম্পাকে নয়, আমি খুব সুস্থ্য মাথায় ধর্ষণ করেছি চৌধুরীর তিন মেয়েকেই। সেতু আর যুথির কাছে আমি নিকৃষ্টতম মানুষ হয়তো হয়েছিলাম। কিন্তু বলে দিয়েছিলাম, শুধু সেতু, যুথি, সম্পাকে ধর্ষণ নয়, আমি ঠান্ডা মাথায় খুন করেছি চৌধুরীর ছেলে দুলাল আর

চৌধুরীর বাবা শেখর চৌধুরীকেও। সেদিন গোটা গ্রাম স্তব্ধ হয়ে শুনছিল আমার কথা। অবাক হয়ে শুনছিলেন জজ সাহেব। তার জীবনে এমন সরল স্বীকারোক্তি দেয়া কোন কয়েদিকে তিনি দেখেননি বলে মন্তব্য করেছিলেন। রায় ঘোষণার পালা। আমি স্বাভাবিক। জানি আর ফাঁসি থেকে কোনভাবে বেরোতে পারবো না। তাতে কোন আফসোসও নেই। কিন্তু না আমার ফাঁসির আদেশ হলো না। রায় ঘোষণার আগে আমার পক্ষ থেকে আমার উকিল জজ সাহেবের কাছে আর্জি করে জানিয়েছিলেন, হুজুর, ওর বয়স কম। গতকাল মাট্রিকের রেজাল্ট বেড়িয়েছে। জেলার মধ্যে ও এক নাম্বার স্থান অর্জন করেছে। ওর প্রতি একটুকু দয়া করবেন। জজ সাহেব আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক স্তব্ধ। লাগাতার এক মিনিট তাকালেন আমার দিকে। বসলেন। মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লিখলেন। মাথা নিচু করে পড়ে শোনালেন। দুইটা খুন আর তিনটা ধর্ষণের স্বঘোষিত আসামী বাদলের যাবৎজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের বাংলা বিধান।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....

.....ছোটগল্প

সন্ধি

অংশু মোস্তাফিজ

এক. রিকন্ডিশন একটা টয়োটা কিনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাদল। এবার থামার সময় হয়েছে। চারদিক কি অদ্ভুত নিয়মেই না দৌড়াচ্ছে। কি বিভৎস্য এক একজন মানুষের দৌড়। জন্মদৌড়। আমি আর দৌড়াবো না। হাটবো না। প্রয়োজন নেই। পেছনের জীবনটার দিকে চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলছিল বাদল। একা একা কথা বলার অভ্যেস কয়েক বছরের। গাড়ি কেনার খবরটা কয়েকজনকে জানাতে ইচ্ছে করছিল। যাদের সাথে মেশা হয়না এক দশক সময়। এক দশক। দীর্ঘ সময়। নিজেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা মুখপ্রিয় বাদলের অনেক কষ্টের ছিল। ছিল না উপায়। কি অপ্রিয় সময়গুলো দুর্দান্ত ঝড় হয়ে বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। ভাবতে কষ্ট হয়। আরো একটি বড় ধরণের শ্বাস ফেলে জিন্সের পকেটে হাত দিলে সেলফোন খুঁজতে। না নেই। থাকার কথাও নয়। মাস ছয়েক হয় একবারে ব্যবসা অফ করে সবগুলো সেলফোন বন্ধ করা হয়েছে। তবু অবচেতন মন ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। এখন পরিচিত কেউ ওর ঠিকানা জানে না।

ভাবনাটা আরো আগের কিন্তু তেইশ বছর বয়সে এসে পরিচিতদের ঘোষণা দিয়েছিল, যে দিন বয়স তেত্রিশ হবে সেদিন গাড়ি কিনবে। যে করেই হোক। রিকন্ডিশন টয়োটা। দৈনতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাখামাখি করে জীবন কাটানো বাদলের ঘোষণা যে শুনেছিল সেই হেসেছিল সেদিন। একজন বলেওছিল, টয়োটা কেন, ফেরারী কিনলেই পারিস! স্বপ্নবাজ বাদল দৃঢ় মানুষের মত বলেছিল, না

টয়োটা। রিকন্ডিশন টয়োটা। উপস্থিত সবাই দাঁত বের করে খলখল করে হেসেছিল। বাদলও হেসেছিল। কিন্তু তারপরের এক দশকে আর হাসা হয়নি।

আজ ওর বয়স সমস্ত তেত্রিশ। ছাব্বিশ বছর বয়সে এসে ব্রান্ড নিউ ল্যান্ডক্রুজার কেনার মত উপার্জন হয়েছিল বাদলের। কিন্তু বাদল অপেক্ষা করছিল তেত্রিশের। রিকন্ডিশন একটা টয়োটার। যখন পকেট ভর্তি টাকা থাকে তখন আর ভাগ্য বিক্রয় করে না। দিনভর উন্মাদের মত গাড়ি নিয়ে ছুটলো বাদল। আজই শেষ ছোটা। চক্রভাগ্যে একটা দিনের জন্যই ওর এতোসব আয়োজন। নির্দ্রিষ্ট গন্তব্য নেই। সামনে যে মোড় পড়ছে সেদিকেই ঘুরাচ্ছে স্টিয়ারিং। জীবনের মতই আবিস্কার করছে রাস্তার মোড়। জীবন আর রাস্তা দুটো একই জিনিস। একবার ইচ্ছে হলো সোজা অনিতার বুটিক হাউসে যাবে। অনিতার মুখোমুখি বলবে, আমার পথ শেষ তাই তোমার কাছে এসেছি। অনিতা বলবে, ওদিক দিয়েই ফিরে যাও। ভুল জায়গায় এসেছো। এমনটি ভেবে আর বনানীর দিকে যাওয়া হলো না। শনি রবিবার বনানীর বুটিক হাউসে বসে অনিতা। অন্যদিনগুলোতে মিরপুরের দুটোতে। আজকাল অনিতাও রুম থেকে বেরুতে চায় না। বাদল অনিতার ভাব বুঝে ওঠে না। একবার ভাবে ওর মতই কি অনিতাও! না তা হবে কেন? এত সুন্দর একটা মেয়ে, ওকে কোন দাগ মানায় না। আবার ভাবে তা না হলে একা মেয়ে এভাবে আকাশ খুড়ে খুড়ে উপড়ের দিকে যায় কিভাবে? কোন উত্তর বেরুই না। মিরপুর এগারোতে পাশাপাশি দু'জনার ফ্ল্যাট। রাত্রি নিবাস। পাশাপাশি থেকেও কথা বলা হয়নি তেমন। বাড়ির সব বাসিন্দাদের এক উৎসবে দু'জনার পরিচয়। অন্যরা সবাই হাসাহাসি করছিল, এত বয়সেও ওদের ব্যাচেলর থাকা নিয়ে। তাও আবার দু'জনই পাশাপাশি। সেখান থেকেই দু'জনের স্বল্প স্বল্প আলাপে দীর্ঘ ঘণিষ্ঠতা। দুপুরের দিকে কয়েকটা লালনের গানের সিডি কিনেছিল। গাড়িতে বসে এখনো ওগুলোই শুনছে বাদল। এক দশক পর নিজের ইচ্ছেয় গান শোনা। লালনের গানে বিশেষ টান ছিলো। দুরন্ত কৌশরে। প্রথম যৌবনে। এলাকার নামী এক গুরুর কাছে গান শিখতেও শুরু করেছিল। সময়মত টাকা দিতে না পারায় গান শেখা আর হয়নি। টাকার অভাবে অপ্রাপ্তির এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। আজ এতো বছর পর এইসব পুরনো কথা মনে পড়ছে।

রাত বারোটার দিকে রুমে ফিরে ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারের খামটা চোখে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হবার কথা নয়। আর একটা মাত্র ইচ্ছে বাকী আছে। সবই তো পুরণ হলো। এবার শুধু একবারের জন্য হলেও সেক্সের স্বাদ। তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সেক্স করা হয়নি। সুযোগ সময় কম আসেনি। তেইশ বছর বয়সে ব্যর্থ হবার পর বাদল সে সুযোগ আর নিতে চায়নি। অপেক্ষা ছিল তেত্রিশের। এখন হবে। অজস্র টাকা আছে। কিছুটা সময়ও আছে। কিন্তু আজ মৃত্যু পরোয়ানা হাতে নিয়ে এতোটা আগে মরতে ইচ্ছে করছে না। আজ থেকে শুয়ে বসে কাটালেও কয়েক যুগ পেরুবে নিশ্চিন্তে। এমন অবস্থানের জন্য কম শ্রম আর মেধা যায়নি। এভারেস্ট আরোহনের মত সেকেন্ডে সেকেন্ডে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনে এগুতে হয়েছে। অবশেষে দশ বছরের রোবট মানব হয়ে বাদলের এটুকু অর্জন। হাসন রাজা মননের বাদল বাস্তবতার যাতাকলে পিশে পিশে আজ কথিত সভ্যতার বুকে চড়ে হাসার যোগ্যতা নিজের দখলে নিয়েছে। এত কষ্ট করে এসে মৃত্যুর খবর ভাল লাগছে না। ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে আরো একবার ফোন করলো বাদল। রিপোর্ট আরো একবার চেক করা যায় কি না। ওপাশ থেকে জানানো হলো, তিনটে ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে চেক করা হয়েছে। সবারই একই রিপোর্ট। মনে পড়লো, তেইশ বছর বয়সেই মাথার সমস্য দেখা দিয়েছিল। স্রেফ টাকার অভাবে পরীক্ষা কিংবা চিকিৎস্যা করা সম্ভব হয়নি। কাউকে বলাও হয়নি। মাকেও না। আজ টাকা থেকেও আর চিকিৎস্যার সময় নেই। ফোন রেখে সিগ্রেট জ্বালালো বাদল। এতক্ষণে পাশের

ফ্ল্যাটে চলে এসেছে অনিতা। ওকে ফোন করে জানাতে ইচ্ছে করছে, অনিতা আমার ব্রেণ ক্যান্সার। খুব স্বল্প সময়ের জন্য আমি আছি। তোমার কাছে চলে আসি? অনিতা বলবে, চাপা রাখো। আমি অনেক ক্লান্ত। এখন তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বাদল বলতে পারতো আমার কাছে তিনটে ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারের রিপোর্ট আছে। গত রাতে রিপোর্টগুলো হাতে পেয়েছি। তাছাড়া আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিনে মিথ্যে বলার ইচ্ছে নেই। না বাদল বললো না। উপোর্যপুরি কাউকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা ভাল নয়। স্মৃতি হাতরিয়ে শোভাকে ফোন করলো। শোভা কৈশরের প্রেমিকা। ঐ সময় দায়ভার নেবার মত ক্ষমতা ছিলনা বলে শোভাকে হারাতে হয়েছিল। স্বামী সন্তানসহ এখন এই শহরেই থাকে। বছর চারেক আগে ফার্মগেটে দেখা। তবু শোভা অটুট ধরে রেখেছে ওর সৌন্দর্য। ব্রেণ ক্যান্সারের খবর অন্তত একজনকে শোনাতে শোভাকে ফোন করেছিল বাদল। শোভা বাদলের পরিচয় জেনেই বললো, মাস তিনেক হয় স্বামী চাকুরি হারিয়েছে। ভীষন বিপদে কাটছে দিনকাল। ঠিকানা দিয়ে শোভাকে সাবা বুটিক হাউসে যেতে বললো বাদল। তারপর খট করে রিসিভার রেখে দিলো। নিশ্চিত কাল শোভা যাবে। বাদল পাঠিয়েছে শুনে ভাল মানের একটা কাজ দেবে অনিতা। বাদল আর অনিতা দু'জনেই বড্ড একা। ভাল করে মেশা না হলেও মনস্তাত্বিক যোগ আছে কোথাও। ভদকার বোতল খুলে গলায় ঢাললো বাদল। কাউকে জানানো হলো না। মা থাকলে হয়তো জানানো যেতো। মা- চলে যাবার আগে ছেলের মাথায় নারকোল তেল দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। দেয়া হয়নি তার। সময় স্বল্পতার জন্য টাকা পয়সা চিন্তার কারন হলো। এতোগুলো টাকা কাকে দিয়ে যাওয়া যায়। সম্ভাব্য উত্তর সহজে বেরুলো না। দীর্ঘ সময় যোগাযোগ ছিন্ন স্বজনদের দেয়া যেতো। ছোট ভাইয়ের ছেলেটার কথা মনে পড়ছে। ওর বয়স এখন চার। এখনো দেখা হয়নি। ওর নামে যদি টাকাগুলো দিয়ে যেত তাহলে কিছুটা স্বস্থ্যি মিলতো। বড় হয়ে ছেলেটা জানতে তার বড় চাচা মারা যাবার আগে তার নামে কয়েক কোটি টাকা রেখে গেছে, যার সাথে দেখাই হয়নি তাহলে ব্যাপারটা অদ্ভুত সুন্দর দাঁড়াতো। কিন্তু টাকাগুলো ভাল নয়। ভাইয়ের ছেলেকে দেয়া যাবে না। তেইশ বছরের আগের জীবন যাত্রা বাদলকে বাধ্য করেছে ভাল মন্দের হিসেব ভুলে যেতে। বিশেষত উনিশ থেকে তেইশ-এই চার বছরের অর্ধাহার অনাহারের চালচিত্র বাধ্য করেছে আজ এখানে দাঁড়াতে। আপাদমস্তক হতাশাগ্রস্ত বাদলের সামনে মাদক আসক্তি ধেকে ব্যবসার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে ধরা দিয়েছিল। ক'জন সহযোগী নিয়ে মাদক ব্যবসা পাল্টে দিয়েছে ওর জীবনের সংজ্ঞা। কয়েকদিন ভেবে বাদল সিদ্ধান্ত নিলো, মৃত্যুর পর ওর টাকা দিয়ে দেশব্যাপি যতগুলো সম্ভব লাইব্রেরী করার। অবশিষ্ট দিনগুলো লাইব্রেরী বাস্তবায়নের কাজেই ব্যয় হতে থাকলো। তখনো সেক্স নামক একটা চাওয়া অধরা।

দুই.

পত্রিকায় কবিতা পড়ে শ্যামলকে ফোন করেছিল অনিতা। অনিতার নাম অনিতা নয়। সাবরিনা। পরিচিতরা সাবা বলে ডাকে। সাবাকে অনিতা বানিয়েছে শ্যামল। বগুড়ায় দু'জনার বাস। সাবা গ্রামের মেয়ে। সবে অনার্সে ভর্তি হয়ে শহরে উঠেছে। সাবলেট থাকে। বন্দি পাখীকে মুক্ত করে দিলে ক্ষণিকেই সব স্বাধীনতার স্বাদ নিতে চায়। বেশি ওড়ে। ডানা ভেঙে ফেলে। সাবারও অনেকটা হয়েছে তাই। গ্রামের সুবোধ সুন্দর মেয়ে শহরে এসে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে চেয়ে জড়িয়েছে মানসিক পলিটিক্সে। শ্যামল- এক আধুনিক কবির প্রাগৈতিহাসিক ফাঁদ। সাবা এ ফাঁদে তারপরও পা দিতে চায়নি। মাস ছয়েক শ্যামলের সাথে মিশে আটকে গেছে মায়া ফ্যাক্টরে। এক ভাবগম্ভীর আলোচনায় সাবাকে শ্যামল বললো, জীবনে অনেক স্বাদ আহ্লাদ থাকে মানুষের। সবার স্বপ্ন পুরন সাধ্যে কুলোয়

না। জীর্ণ জীবনের সাথে সঙ্গোম করতে করতে রুচিহীনতায় ভুগছি। একটু আধুনিকতার স্বাদ নিতে চাই। অন্তত একবারের জন্য হলেও। সাবা নিরব হয়ে শুনছিল। শ্যামল সাবার হাতে হাত রেখে বললো, কিছু টাকা জমিয়েছি। আমার ইচ্ছে এক অত্যাধুনিক পরিবেশে জোৎস্নাবিহার করবো। শহরের অত্যাধুনিক এক হোটেলের নাম বলে বললো ওখানে বেলকনিতে বসে কাটাবো এক জোৎস্নাস্নাত রাত। সাবা তুমি আমার পাশে থাকবে। সাবা চমকে উঠে না বললো। শরীরে নিঃশ্বাসেরও ছোঁয়া দেবোনা বলে আস্থা দিলো শ্যামল। সাবা শ্যামলকে বিশ্বাস করলো। এক জোৎস্নাঝড়া রাতে তাই শ্যামলের পাশে হেটে উঠেছিল শহরের এক নাম্বার হোটেলে। এক কবিকে এক রাতের সঙ্গ দিয়ে বিমূর্তবাদের অংশ হতে চাইলো সাবা। কিন্তু শ্যামল সেদিন কবি ছিল না। কবিরা সব সময় কবি থাকে না। সাজানো নাটকের দক্ষ অভিনেতাও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। খল অভিনেতা বলাটাই যথার্থ। হাই ভ্যলিউমে গান চালিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত খেতে চাইলো সাবার প্রথম শরীর। সাবা আধুনিক হতে চাইলেও সতিত্ব বিসর্জন দিতে তখনো নারাজ। শ্যামলকে প্রতিশ্রুতি ও মনুষত্ব জাগিয়ে দেবার বৃথা চেষ্টাও। কিন্তু শ্যামল তখন মানুষ নয়- একজন পুরুষ। সাবার তখন সতের। শ্যামলের সাতাশ। শরীর অসমর্থন করেনি কিন্তু নিজের কাছে বড্ড পরাজিত মনে হয়েছিল সাবার। একজন কবির কাছে নারীত্বের অবমাননা অসহ্য মনে হয়েছিল। স্বভাবতই সাবা ছিল এক টুকরো চঞ্চল প্রাণ। সাবা মানে উচ্ছলতা। সাবা মানে সম্পূর্ণতা। কিন্তু সে রাতের পর সাবা বদলে গেল। হোটেল থেকে ফিরে দীর্ঘ সময় কেঁদে নিথর হয়ে গেল সাবা। বিশ্বাস বিপর্যয়ে পুড়ে গেল চঞ্চলতা- উচ্ছলতা। দ্বিতীয় বিপর্যয় আসতে পনের দিনও সময় লাগেনি। সাবা যে বাড়িতে সাবলেট থাকতো সে বাড়ির কর্তাকে মামা বলে সম্বোন্ধন করতো। সেদিন মামা ছাড়া বাড়ির সবাই আত্মীয়ের বাড়িতে। ঝুম বৃষ্টির রাত। মধ্য রাতে অর্ধেকেরও কম বয়সী সাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি মামা। সাবা সেদিন কান্নার চেয়ে গ্রাম শহরের তুলনা করতে চাইলো বেশি করে। কোনভাবেই বাড়িতে এসব জানানো যাবে না। তাহলে পড়াশোনা শেষ। সাবার স্বপ্ন ছিল চাটার্ড ব্যাংকে চাকুরি করবে। তাই কম্প্রোমাইজের চেষ্টা। সাবলেট ছেড়ে এক ছাত্রী হোস্টেলে উঠলো সাবা। কিছুদিন পর নাচ শেখার জন্য অতিরিক্ত টাকার দরকার হলে একটা পার্ট টাইম জব নিলো। সুন্দরী প্রেজেন্টেবল মেয়ে, জব পেতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু সে একই কাহিনী। তিন মাসের মধ্যেই বসের লালসার শিকার। বসের পর অফিসের কলিগ, ক্লাসের দু'একজন বয়ফ্রেন্ডদের সাথে বেড়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। নিজের সাথে এভাবে বারবার হারার পর সাবা এক হিন্দি সিনেমা দেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসলো। অনেক হয়েছে আর নয়। এবার অর্জনের পালা। এমনিতেই যখন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিজেকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে তখন টাচ ভ্যালু নিলে ক্ষতি কি? ব্যাস একটা সিদ্ধান্তে জীবনের মোড় পাল্টে গেল। সাবা তখন সাবরিনা কিংবা সাবা থেকে হয়ে উঠলো অনিতা। কড়া দামে খুব অল্প সময়েই অনিতা হয়ে উঠলো শহরের প্রথম শ্রেণীর কট। শহরের বয়স্ক ধনীক শ্রেনী লুফে নিলো অনিতাকে। দিনদিন সমবয়সীদের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল অনিতা। অনিতার মূল্য এই শ্রেণীর উপার্জনে কুলোয় না। তাই ফ্রেন্ডের চেয়ে ফ্রেন্ডের বাবা হয়ে উঠলো অনিতার প্রিয়জন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাসী পাখী অনিতাকে চমকে দিলো। পাঁচ পুরুষের সঙ্গে বেশ্যা আর বত্রিশ বছর বয়সে নারী। কোথায় তবে অবস্থান আমার? অনিতা নিজেকে খুঁজে পেলো না ভাবনা ত্রিসীমানায়। কত পঞ্চপুরুষের ঝড়ো রাত দিন ওকে বেশ্যার থেকে মহানতর করে তুলেছে। নারী হতে ঢের বাঁকী এখনো। সবে পেরুলো কুড়ি। অনার্স শেষ করে তিনটে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের হিসেব দেখে আরেকবার চমকে ওঠা। এই বয়সে কোন মেয়ের এতোটা উপার্জন হতে পারে! ব্যাংক থেকে

সবগুলো টাকা তুলে তার মাঝে বিবস্ত্র ঘুমোতে ইচ্ছে করলো অনিতার। টাকা তো নয়, ওগুলো শরীরেরই এক একটি অংশ। প্রচন্ড নেশায় নির্জিব করতে ইচ্ছে করলো নিজেকে। কিন্তু না, টাকার নেশার কাছে মাদক সামান্যই। আরো টাকা চাই। আরো। অনিতা ধরেই নিলো অনেকদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওর। চার বছর আগে শ্যামলের সাথে প্রথম যে রাত, সে রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তারপরের বেঁচে থাকা বোনাস টাইম। বোনাস টাইমে হাত খুলে খেলাটাই আনন্দ। এ আনন্দে নিজেকে ভাসাতে ভাসাতে ঢাকার দিকে পা বাড়ালো অনিতা। নির্ধারিত উচ্চ মূল্যে সমস্যা হচ্ছিলো প্রথম দিকে। অনিতা আরো আকর্ষিত করতে নামকরা প্রাইভেট ভার্সিটিতে ভর্তি হলো। আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। অনিতা নিজেকে গড়ে তুললো মেট্রোপলিটন ধাঁচের প্রেজেন্টেবল করে। এক ধাপেই মূল্য হয়ে গেল দ্বিগুন। আরো ছয় বছর এক চেটিয়া নিজের বিজয়োৎসব দেখার পর থামতে চাওয়া। সম্ভব নয় জেনেও একটা পিছুটান তৈরীর ইচ্ছে জাগলো। বাবা মা, স্বজনদের সাথে সম্পর্ক শেষ হয়েছে এ জীবন শুরুও দ্বিতীয় বছরেই। তারপর অনিতা সুতো ছেড়া রঙ্গিন ঘুড়ি।

প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে মিরপুরে পরীক্ষামূলক সাবা বুটিক হাউস শুরু করেছিল অনিতা। লাক ফেবার। সাফল্য পেতে সময় লাগেনি। অনিতা তিনটে বড় বুটিক হাউসের সত্ত্বাধিকারী যখন বয়স একত্রিশ। এখন বড় বেশি ঘর বাধতে ইচ্ছে করে কারো সাথে। আর ভাললাগে না। একা একা এত টাকা দিয়ে কি হবে? সময় ঠিক হয়ে উঠলো সতীন। বাদলের কথা মনে পড়ে। ভালবাসাও হয়ে গেছে বাদলের প্রতি। রাত্রি নিবাস নামক বাড়িতে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে দু'জনের অবস্থান। বাদল অনিতাকে কিম্বা শুধু সঙ্গ চায় এটা অনিতা জানে। কিন্তু উপায় নেই। অনিতার নারী হতে অর্থাৎ বত্রিশা হতে যখন মাস চারেক বাকী তখন ধরা পড়লো এইডস। অনিবার্য মৃত্যুর সাথে বাদলকে জড়াতে চায়নি অনিতা। তাই বারবার ফেরানো।

তিন.

সেদিন অনিতার জন্মদিন। পূর্ণ বয়স্কা। বত্রিশা। নারী হবার মহেন্দ্রক্ষণ উপলক্ষ্যে অনিতার ফ্ল্যাটে বাদলের আমন্ত্রণ। দু'জনারই শারিরীক অবস্থা করুন। যে কোন সময় কলিংবেল টেপার আশায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। বাদল অনিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে খুলে দিলো অতীতের সব ডালপালা। অনিতাও যখন সব বলে ফেললো তখন রাত শেষের দিকে। কান্না পাচ্ছে দু'জনারই। অনিতা বাদলকে আহ্বান জানালো ওর শেষ ইচ্ছে পুরণের। বাদল সারা দিলো। প্রথম এবং শেষ আলিঙ্গন আর ভালবাসার সমুদ্রে ডুবে যেতে চাইলো ওরা। কিন্তু স্বাদ অনুভবের সময় পেল না বাদল-অনিতারও পাওয়া হলো না ভালবাসার অনুভূতি। অলৈকিক কলিংবেল বাজলো। দরজা খুললো। মৃত্যু চুম্বনে দু'জন আঁধারে ডুবে গেলে জগৎময় ভোরের আলো ফুটলো।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....গল্প

ছেদ

অংশু মোস্তাফিজ

হো হো করে হাসির শব্দ শুনে ছেলেটি পেছনে ফিরে তাকায়নি। তবে বুঝতে পারছিলো হাসির শব্দ একটু জোড়েই হচ্ছে। তিন কি চার জন হবে হয়তো। ও এসবে নজর দিচ্ছে না। বুক বরাবর হাত জোড় করে দুর্গাকে দীর্ঘ সময় প্রনাম করছে। এ রকম প্রনাম ও আগেও করেছে তবে এবারের ব্যাপারটি ভিন্ন। বন্ধুদের সাথে বাজি লেগে ও প্রনাম করছে। বাজি ছিল লাগাতার হাফ ঘন্টা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে হবে। ও এতে রাজি হয়েছিল। শ শ নারী পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে যেন জন্মসাধন করছে। আজ নবমী। কাল বিজয়া দশমী। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আনন্দের আয়োজন। রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। এখনো শ শ মানুষ মন্দিরে আসছে। যাচ্ছে। এই শহরে কয়েক হাজার সনাতনী ধর্মের মানুষ রয়েছে। আজকাল দেখে বোঝাই যায় না কে হিন্দু কে মুসলিম আর কে খ্রিষ্ট্রান বৌদ্ধ। ধর্ম মানুষকে আর সেভাবে আলাদা করে রাখতে পারছেনা।

ছেলেটি গিয়েছিল সুন্দরী সব হিন্দু মেয়ে দেখতে। সাথে ছিল মাসুম সুপ্রিয় বিমল এনামসহ আরো দু'চারজন বন্ধু। সুপ্রিয় বলেছিল সব হিন্দু মেয়েরাই দেখতে সুন্দরী হয়। ও বলেছিল, ধাৎ, তাই হয় নাকি? সুপ্রিয় বলেছিল, হ্যা, তাই। ছেলেটিও এই সময়ে অসুন্দর কোন হিন্দু মেয়ের মুখ মনে করতে পারলো না। ক'টা হিন্দু মেয়ের সাথে আর মিশেছে। হাইস্কুলে রমা নামের একজন ছিল। দারুণ সুন্দর রমা। ওকে তেমন পাত্তাই দিতো না। ওর চেহারা কিন্তু অসুন্দর নয়, তবু রমা পাত্তা দিতো না। রমার বইয়ের মধ্যে ও একদিন চিরকুট রেখেছিল। তারপর রমা আর কথাও বলেনি ওর সাথে, কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতো। ও আর এতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

পেছন থেকে একটা হাল্কা ধাক্কা পেল ছেলেটি, সেই সাথে এক নারী কন্ঠ বললো, স্যরি। ও তখনো পেছনে ফিরে তাকালো না। মন্দিরের একবারে সামনে একনিষ্ঠ দাঁড়িয়ে প্রণাম করছে। জোরে হাসির শব্দ পেল। নাম ধরে বেশ জোরে এনাম বললো, চালিয়ে যা। ও গানের দিকে মনোনিবেশ করলো। দুটো মাইকে গান বাজানো হচ্ছে। একটা মেয়ে গাচ্ছে, এবারের পুঁজোতে লাল শাড়ি নেবো, বাহারী খোঁপাতে লাল ফুল দেবো। পরের লাইন না বাজতেই ও বেশ জোরে ধাক্কা পেল। একটা তরুনী প্রায় ছিটকে সামনে এলো। আরো বেশ কিছু ধাক্কা, সবগুলো নারী শরীরের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না। সেই সাথে বুঝে গেল, পেছন থেকে মেয়ে দেখে এই ধাক্কাগুলো মারছে ওর বন্ধুরাই। ওদের কন্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে জোরে। সামনে ছিটকে পড়া মেয়েটি ওকে অবলম্বন করে পাশাপাশি দাঁড়ালো। বললো, স্যরি, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য। দেখছেনতো ছেলেগুলো কেমন বদমাইশ, মেয়ে দেখলেই ধাক্কাধাক্কি করে। ও বললো, শাড়ি কৈ? মেয়েটি বললো, কিসের শাড়ি? ছেলেটি বললো, লাল শাড়ি। মেয়েটি হেসে হাতজোর করে দেবীর পুঁজো করতে প্রস্তুত হলো। এতোক্ষণে ওর বন্ধুদের সাথে অন্যান্য বখাটেরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা বাল্ব ভাঙ্গায় আলো অনেক কমে গেল। কয়েক সেকেন্ডেই পরিবেশটা বিশৃংখলায় ভরে গেল। হৈ চৈ বাড়লে ও পিছনে ফিরে দেখলো নিরাপত্তারক্ষার্থী পুলিশ ছেলে দেখলেই পেটাচ্ছে। যে যে দিক পারছে ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশ ক্রমেই সামনের দিকে আসতে লাগলো। ও তখনো হাত জোর করে দূর্গাকে প্রণাম করেই যাচ্ছিলো। আর কয়েক মিনিট পরেই পেরুবে আধা ঘন্টা। পাঁচশ' টাকার বাজি। একটা ছোকরা পুলিশ ওকে লক্ষ্য করে সামনের দিকে আসছিলো। এতোক্ষনে প্রায় সব ছেলেই পালিয়েছে। আশেপাশে বয়স্ক লোক আর মেয়েরা। ও কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। এমন সময় দ্রুত একটা হাত ওকে টেনে মন্দিরের

পেছনের দিকে নিয়ে গেল। ছেলেটি দেখলো, এই সে মেয়ে, যাকে আচমকা লাল শাড়ির কথা বলেছিল। মেয়েটি বললো, আপনার বোধহয় পুঁজো পূর্ণ হলো না। ও বললো, না মানে আর কয়েক মিনিট। একটা বুড়ো পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। মেয়েটি বললো, কি নাম আপনার? ছেলেটি তোতলাতে তোতলাতে বললো, নাম মানে আমার নাম, রমেশ। মেয়েটি বললো, আমি শ্যামা। শ্যামা দাস। শ্যামার চেয়ে রমেশ তিন চার বছরের বড় হবে। শরীর স্বাস্থ্য চেহারা সবদিক থেকে আকর্ষণীয় রমেশ। শ্যামা রমেশকে বারবার কিছু বলতে চেয়ে আড় চোখে দেখছিলো। রমেশ শ্যামাকে লক্ষ্য করলো। শ্যামা বললো, কেমন ওরা বলুনতো পুঁজোটাও করতে দিলো না। রমেশ বললো, তোমার জন্যই তো ওরা পুঁজো করতে দিলো না। -আমার জন্য মানে! -হ্যা তোমার জন্য, এতো সুন্দর কেন তুমি?- শ্যামা মাথা নিচু করে বললো, আমি বুঝি সুন্দর!- ভীষণ। আস্ত একটা পরী। শ্যামা বললো, চলুন যাই এতোক্ষনে সব ঠিক হয়ে গেছে।

সপ্তাহ দুয়েক পর আবারো শ্যামাকে কলেজে আবিস্কার করলো রমেশ। ক্লাশ শেষে সবে ক্যাম্পাস থেকে বেরুবে এমন সময় পেছন থেকে একটা হাত ওর কাঁধ স্পর্শ করলো। ঘুরে দেখে শ্যামা। সেই শ্যামা। শ্যামা হাপাচ্ছে। জানালো, অনেকক্ষণ থেকে পেছন থেকে ডাকছিলো। রমেশ খেয়াল করেনি বলে প্রায় দৌড়ে আসতে হলো। কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রী সরকারী আযিযুল হক কলেজে। ক্যাম্পাসে একটা শ্যামার ডাক কান পর্যন্ত পৌঁছা কঠিন। তাছাড়া কত শ্যামাই ডাকতে পারে রমেশকে। শ্যামা বললো, যদি অতি তাড়া না থাকে তাহলে চলুন একটু বসি। রমেশ সাড়া দিলো। সুপ্রিয়র ক্যাফেতে দুজনার প্রথম বসা। কলেজের পাশেই সুপ্রিয়র ক্যাফে। কলেজের অনেকেই এখানে প্রেম করতে আসে। অনেকে একটু বেশি টাকা দিয়ে যায় আরো ভেতরে। অনেকগুলো গোপন কেবিন আছে সুপ্রিয়র ক্যাফেতে। রমেশ গত রোববারেই একজনকে নিয়ে ঢুকেছিল গোপন কেবিনে। হয়তো শ্যামাও ঢুকেছিল কাউকে নিয়ে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে শ্যামা বললো, এখানে আগে এসেছেন কখনো? - হ্যা, মাঝেমাঝেই তো আসি।- না মানে বলছিলাম ঐসব কেবিনের কথা। রমেশ শ্যামার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি গেছো কখনো? শ্যামা চোখ নামিয়ে বললো, না। রমেশ বললো, স্যরি তুমি করে বলার জন্য। শ্যামা বললো, ঠিক আছে, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। তাছাড়া..। কথা শেষ না করতেই রমেশ বললো, তাছাড়া কি? শ্যামা বললো, আপনার বোধহয় সময় নষ্ট করছি, চলুন উঠি। রমেশ বললো, একটা পরীর মত সুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে যেতে ভালো লাগবে না আমার। রমেশের কথায় ধাক্কা খেল শ্যামা। মাথা নিচু করলো। রমেশ টেবিলের উপরে রাখা শ্যামার হাতের উপর হাত রাখলো। শ্যামা অনেকটা শিউরে উঠার ভঙ্গি করলো। ফোন নাম্বার, ঠিকানা নেবার পরেও আরো ঘন্টা খানেক পাশাপাশি বসে ছিল দুজন। ইকোনোমিক্সে মাস্টার্স করছে রমেশ। শ্যামা দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন।

মেসে ফেরার সময় অনেকগুলো মদ খেয়েছিল রমেশ। এতোটা মদ একসাথে কখনো খায়নি সে। প্রায় পুরো বোতলই। দুটো টিউশনির বিল একসাথে পেয়েছে। এক জায়গায় দুই হাজার, অন্যখানে দেড় হাজার। এক বেসরকারী ব্যাংক ম্যানেজারের ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া মেয়েকে ইকোনোমিক্স পড়ায়। সপ্তাহে তিন দিন যেতে হয় বাসায়। মাইনে দেড় হাজার টাকা। মেয়েটির নাম টুম্পা। দু বছর থেকে টুম্পাকে পড়াচ্ছে রমেশ। টুম্পা দেখতে ততটা সুন্দর নয়। কিন্তু রমেশের প্রেমে পড়ে গেছে। মাস খানেক হবে প্রতিদিন চার-পাঁচ বার করে একটা অচেনা নাম্বার থেকে রমেশের মোবাইলে ফোন আসে। নাম বলে না, এখন রমেশ কি করছে, কেমন আছে, সময়মত খাওয়া হলো কি না-এসব শুনে রেখে দেয়। রমেশেরও কেন জানি মেয়েটার সম্পর্কে জানার আগ্রহ হয়নি। তবে ও ধরেই নিয়েছে এ

ফোনটা করে টুম্পা। বুঝতে পেরেছে আর বেশি দিন পড়ানো যাবে না টুম্পাকে। টুম্পার বাবারও আজকাল রমেশকে জড়িয়ে ভাবনা নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে রমেশকে। ভদ্রলোক দেখা হলেই স্বপ্ন দেখান আর দু'এক বছর পর রমেশের কোন না কোন ব্যাংক ম্যানেজার হবার বিষয়ে। সেদিন রমেশকে বলেই দিয়েছে, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি শুধু পড়াটা শেষ করো, তোমার ম্যানেজার করানোর দায়িত্ব আমার। রমেশ অবাক হয়েছিল কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি। টুম্পার মাও বেশি বেশি করে চা নাস্তা দিচ্ছেন। দুপুরে ভালো খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন। সেদিন বলেছিলেন, মেসে বোধহয় তোমার সমস্যা হচ্ছে, তুমি বরং এ বাড়িতেই থাকো। বিনিময়ে কিছু দিতে হবে না। এ বাড়ির ছেলের মতই থাকবে। সময় করে একটু টুম্পাকে পড়াবে। তাছাড়া এ বাড়িতে তো অনেক রুম। থাকবার মত আমরা মাত্র তিন জন মানুষই। রমেশ হ্যা না কিছু না বলে শুধু শুনেছিল। এতোদিন টুম্পাকে ড্রয়িং রুমের এক টেবিলে পড়াচ্ছিলো রমেশ। বেশ কিছু দিন থেকে টুম্পার বেডরুমে পড়াতে হচ্ছে। দরজার পর্দা ফাঁক থাকলে কাজের মেয়েটা পর্দার ভিড়িয়ে দিয়ে যায়। পড়ানোর এক ঘন্টার মধ্যে এ ঘরে আসে না কেউ। টুম্পাও পড়ার চেয়ে স্যার আপনার চুলে এনলিভেন জেল দেবেন, মনপুরা সিনেমা দেখেছেন কি না জাতীয় প্রশ্ন বেশি করছে। শ্যামার সাথে সুপ্রিয়র ক্যাফে থেকে ফিরে রমেশ যখন টুম্পাদের বাড়িতে গেল তখনই বিপত্তিটা ঘটলো। টুম্পার মা রমেশকে ডেকে হাতে সাদা রংয়ের একটা খাম দিয়ে বললেন, আজ টুম্পাকে পড়াতে হবেনা। এমনি দেখা করে যাও। আর বলছিলাম কি, দুখানে টিউশানি করতে তোমার বোধহয় সমস্যা হচ্ছে। তারচেয়ে তুমি ওখানে টিউশানি ছেড়ে দিয়ে শুধু টুম্পাকেই পড়াও। সপ্তাহে চারদিন এসো, এখন থেকে টুম্পার বাবা তোমাকে তিন হাজার করে টাকা দিতে বলেছে। রমেশ সোমা আর ওর ছোট ভাইকে পড়িয়ে দু' হাজার টাকা পায়। সোমার বাবা ব্যবসায়ী। সোমা দেখতে সুন্দর। ইকোনমিক্সে অনার্স ফাস্ট ইয়ার এবার। গতদিন এসব কথা শুনেছে টুম্পার মা। তাই এখন বলছেন, শুধু টুম্পাকেই পড়াতে। কি আশ্চর্য, ওরা রমেশকে প্রায় জোর করেই জামাই করে ফেলেছে! রমেশ ভাবলো, পড়ার জন্য ও যখন প্রথম এ শহরে এসেছিল তখন বাবা সময় মত টাকা দিতে পারেননি। কতরাত না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। এখন বাড়ি থেকে মাসে আসছে পাঁচ হাজার টাকা। টুম্পার বাবা দিতে চাচ্ছেন তিন হাজার টাকাসহ বাড়িতে থাকার জায়গা, সোমারা দিচ্ছে দু'হাজার টাকা। এই টাকাগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে যাচ্ছে ভেবে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জিম্মি হয়ে যাচ্ছে কি, জিম্মিতো অনেক আগেই হয়ে গেছে। শহরে আসার কয়েক মাস পর্যন্ত যখন রমেশের বাবা ঠিক পরিমানে টাকা পাঠাতে পারছিল না। যখন স্কুলের ফাস্ট রেজাল্ট করা ছেলেটির পড়াশুনা টাকার জন্য বন্ধ হবার উপক্রম তখনই বিক্রি হয়েছিল রমেশ। রমেশের এক দূঃসম্পর্কের ধনী আত্নীয় মেয়েকে বিয়ে করতে হবে শর্তে রমেশের সম্পূর্ণ পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যে বাবা মাসে দেড় হাজার টাকার জায়গায় হাজার টাকা দিতেও হিমশিম খায়, সে বাবা যখন মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতে লাগলেন তখন রমেশ অবাক হয়েছিল। মাসে ঠিক দেড় হাজার টাকা খরচ করে অবশিষ্ঠ টাকা জমিয়েছিল। তারপর মাস ছয়েক পর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারে ও বিক্রি হয়ে গেছে! সেদিনই বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল রমেশ। চোখমুখ বেয়ে কান্না আসছিলো। সবার অগোচরে টয়লেটে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। সে দিনই গ্রামের ছেলেটি শহরের মদের দোকানে গিয়ে কিনেছিল ভদকার বোতল। অনেক দিন আর বাড়িতে যায়নি। মাস ছয়েক পর রমেশের ক্রয় সূত্রে মালিক কিংবা চুক্তি ভিত্তিক শ্বশুর শহরে এসে রমেশকে বুঝিয়েছেন বাস্তবতা। সেদিনই একটা সেলফোন কিনে দিয়েছিল রমেশকে। পরদিন থেকেই ফোন করে রমেশের চুক্তি ভিত্তিক বউ ডলি।

রমেশ বাধ্য হয়েছিল ডলির সাথে ফোনে ওর ইচ্ছামত কথা বলতে। রমেশ অনুরোধ করেছিল প্রতিদিন ফোন না করতে। তারপর থেকে ডলি যে যে দিন ফোন করেছে রমেশ সে সে দিন খেয়েছে ভদকা। শ্বশুরের টাকায় বেশি টাকা দিয়ে একা একটা রুম নিয়ে থাকে রমেশ। ঘরেই থাকে ভদকার বোতল। ডলি দেখতে অসুন্দর নয়। অসুন্দর যেন অন্য কোথাও। রমেশকে বারবার শুনিয়েছে ও গ্রামের সবচেয়ে আভিজাত্যবান ধনী ঘরের রূপসী মেয়ে জাতীয় কথাবার্তা। জীবনের দায়ে প্রচন্ড অরুচি নিয়েও এসব কথা দিনের পর দিন শুনেছে রমেশ। এসএসসি ফেল করার পর আর পড়েনি ডলি।

বাইরে থেকে দরজা খুলতেই হঠাৎ করে একগুচ্ছ সাদা আলো চোখে লাগায় ঘুম ভাংলো রমেশের। চেয়ে দেখে শ্যামা। উঠে বসলো রমেশ। ফোন দিলে রিসিভ করোনা, দুপুর বারোটায়ও ঘুম থেকে জাগোনি, শরীর খারাপ নাকি বলে রমেশের কপালে হাত বুলালো শ্যামা। রমেশ শ্যামার হাত জড়িয়ে ধরতে চেয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। বললো, লাল শাড়ি পরেছো কেন, টুকটুকে পরির মত মনে হচ্ছে যে! শ্যামা বললো, তোমার জন্য। চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে যেয়ে রমেশ লক্ষ্য করলো শ্যামা কাঁদছে। সিগারেট জ্বালালো রমেশ। শ্যামা বললো, ফোন রিসিভ করো না কেন, কতদিন কলেজে আসো না। সবসময় তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। উদ্ভ্রান্তের মত রমেশ প্রশ্ন করলো, কেন? শ্যামা বললো, ভালবাসি তোমাকে। তারপর আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো শ্যামা। রমেশ চোখ মুছে দিতে গেলে শ্যামা ওর বুকে মুখ লুকাতে চেয়েছিল। রমেশ ব্যাপারটিকে আর বেশিদুর গড়াতে দেয়নি।

কয়েকদিন পর সুপ্রিয়র ক্যাফেতে মুখোমুখি বসে শ্যামা বলেছিল, রমেশ চলো বিয়ে করি। রমেশ ধীরে ধীরে মাথা উপরে তুলে বললো, এখনই বিয়ের ব্যাপার আসছে কেন? শ্যামা শক্ত করে রমেশের হাত চেপে বললো, তোমাকে হারাতে চাই না। ক'দিন আগেই আমাদের পরিচয়। আমাকে দেখো। বোঝ। রমেশের কথা শেষ না হতেই শ্যামা বললো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। রমেশ বললো, একটা ব্যাপার এখনই পরিস্কার হওয়া দরকার। আমি রমেশ নয়। প্রশ্নোবোধক চোখে তাকালো শ্যামা। আমি দিপু। দিপু শাহরিয়ার। -তাহলে..? - হ্যা সেদিন দুর্গাকে পুঁজো করার বাজি লেগে আজ তোমার সাথে..। শ্যামা বললো, তারপরও যেকোনভাবে আমি তোমাকে..। কারো কোন কথা আর পূর্ণ হচ্ছে না। এতোটা জনাকীর্ণতার ভেতরেও গুমোট নির্জনতা দুজনের মাঝে। সেদিন কথা আর বেশি এগুলো না। সুপ্রিয়র ক্যাফে থেকে ওঠার সময় শেষবারের মত শ্যামা দিপুকে বললো, তোমাকে চাই আমার, গভীর ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে। কথা শেষ হতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শ্যামা। এক মুহূর্ত্বেই থেমে গেল কোলাহল। সবাই দেখছে ওদের দুজনকে। বখাটেদের দু'একজন কড়া ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ঘটনা কি? কোন হেল্প লাগবে কি না! শ্যামা দিপুর হাত টেনে ক্যাফে থেকে বেড়িয়ে রিকশাতে উঠলো। তারপর চার মাসে তেমন কথা বা দেখা হয়নি দুজনার মাঝে।

মা মারা গেছেন শুনে দিপু যখন উদ্ভ্রান্তের মত বাড়ি যাচ্ছে তখন শ্যামার ফোন। শ্যামার সাথে মাস চারেক দেখা করেনি দিপু। কয়েকবার মেসে এসেছিল দিপু দেখা করেনি। আজ তৃতীয়বারের মত ফোন করেছে। আগের দুইবারে দিপু ওকে বুঝাবার চেষ্ঠা করেছে দিপুর সামাজিক অবস্থা বনাম অন্যধর্মের মেয়েকে বিয়ে করার সম্ভাব্য সমস্যাগুলো। শ্যামা কিছু বুঝতে চায়নি। আজও চাইবে না। ফোন অফ করলো দিপু। মাকে মনে পড়ছে চরম ভাবে। বৃত্তের বাইরের সামাজিক অবস্থানে একমাত্র মা'ই ছিল অনেক কিছু শেয়ার করার একজন। মায়ের অন্তোষ্টক্রিয়া শেষ হবার তৃতীয় দিনে পারিবারিকভাবে মিটিং বসেছে। পাড়ার দু'একজন মুরব্বিসহ আত্নীয়স্বজন বসেছে। দিপুও। কথা

হবে ওকে নিয়েই। ডলির বাবা বলছেন, দিপুর মা'র পর মহিলাশূণ্য হয়ে পড়েছে বাড়ি। এভাবে সংসার চলতে পারেনা। তারা এখনই ডলিকে দিপুর কাছে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে। সম্মতিও দিলো সবাই। দিপু মাথা তুলে সবার মুখের দিকে তাকালো। অনেক কিছু বলার ছিল। অথচ আজ কিছু নেই বলার।

বিয়ের কয়েকদিন পর শ্যামাকে ফোনে জানিয়েছে দিপু। শ্যামা স্বভাব সুলভ কেঁদেছে। শ্যামাকে দেখলে মনে হয়না এ মেয়ে কাঁদতে পারে। শহরের শপিংমলে পোশাক প্রদর্শনীর আস্ত একটা সদাহাস্য পুতুলের মতই শ্যামা। মাস খানেক পর দিপু শহরে ফিরে শ্যামাকে ফোন দিলো। দু'বার বেজেছে। রিসিভ হয়নি। তৃতীয়বারে রিসিভ হলে ওপাশ থেকে জানতে চাইলো কে বলছেন। দিপু শ্যামাকে চাইলে বেশ নিবর হয়ে মেয়েটি জানালো, মাসখানেক হয় আপু মারা গেছে। ঝাঁকুনি খেল দিপু। সুপ্রিয়কে ফোন দিলো। সবকিছুই জানতো সে। সুপ্রিয় জানলো, প্রায় মাসখানেক আগে সুসাইড করেছে শ্যামা। কিছু বোঝার মত সামর্থ দিপুর নেই। বুঝতে পারলো, অনেক দিন ও মদ খায়নি। এখনই ওর ভদকা খাওয়া দরকার। বুঝলো, নিজের অজান্তেই দীর্ঘদিন থেকে ও বয়ে বেড়াচ্ছে এক বুক তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণা মেটাবার চূড়ান্ত আয়োজন করা দরকার।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....ফিচার.....

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ব্রেণওয়াশ করছে হিন্দি সাংস্কৃতি

অংশু মোস্তাফিজ

টিভি চ্যানেল, রেডিও, সিনেমা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভারতীয় সাংস্কৃতি বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতির উপর প্রবল প্রভাব ফেলছে। সাংস্কৃতি মানুষের মানবিক চর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসনে বাংলাদেশীরা ক্রমেই ভারতীয় মেজাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। যা দেশীয় সাংস্কৃতিক বলয়ের সাথে সরাসরি যুদ্ধ বলে বিবেচিত। সাংস্কৃতির কড়াল আগ্রাসনে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মানসিক ভীত নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতীয় সাংস্কৃতি। ফলে তরুন প্রজন্ম দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। একুশ শতকের শুরুতেই এই সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবিলা করতে না পারলে ভবিষ্যতে এ সংকট পুরো দেশের উপরই প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতীয় কিংবা হিন্দি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে কেবল দেশপ্রেমই ব্যহত হচ্ছে না, পারিবারিক-নৈতিক-সামাজিক মূল্যবোধেরও সঙ্কটে পড়ছে দেশ। অহেতুক অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে রক্ত দিয়ে অর্জন করা ভাষা। ভারতের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আমরা আরো সহজ করে দিচ্ছি তাদের অসংখ্য টিভি চ্যানেল আমাদের স্যাটেলাইটে সংযুক্ত করে।

এমনকি জাতীয় অনুষ্ঠাণ বলতে ভারতীয় শিল্পীদের ডেকে একে। এতে অর্থনৈতিকভাবেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। সবচে' বড় যে ক্ষতিটা আমাদের হচ্ছে তা হলো আমরা ক্রমেই আমাদের নিজস্ব চেতনা হারাচ্ছি। বিদেশী কালচারের দ্বারা আমাদের ব্রেণওয়াশ হচ্ছে।

আশির দশকে বাংলাদেশী গৃহবধূদের মনোরঞ্জনের জন্য ভিডিও ক্যাসেটে চড়ে এ দেশে ভারতীয় হিন্দি সিনেমার আগমন। এরপর নব্বইয়ের দশকে এসে হিন্দি টিভি চ্যানেল। তারপর চলমান দশকে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বেড়াজালে আটকে আছে আমাদের সব বয়সী মানুষ। ইন্টারনেটে অন্তত ৫০টি পর্নো সাইট রয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় ভারত থেকে। এখানে নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। ভারত থেকে ফেন্সিডিলের মতই বাংলাদেশে পাঠানো হয় ভারতীয় চটি। চটি সেক্সের গল্পের বাইয়ের নাম। ইন্টারনেটে চটি নিয়ে যেসব সাইট রয়েছে সেগুলো প্রায় সবগুলোই অসম যৌন অভিজ্ঞতা ও ধর্মে নিষিদ্ধ নারীদের সাথে যৌনাচার সম্পর্কে গল্পে ভরা। বাংলাদেশী কিশোররা সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেটে বসে এসব চটি পড়ছে, ভিডিও সেক্স দেখছে। দেশের ধর্ষণ বেড়ে যাবার এটাও একটা মারাত্বক কারন। শহরের সাইবার ক্যাফেগুলোর পাশাপাশি কমদামে পাওয়া এমপি ফোর মোবাইল ফোনে ভিডিও সেক্স দেখা যায় খুব সহজে। অনেক তরুণ নিজেই উৎসাহী হয়ে চটি গল্প লিখে ইন্টারনেটে ছাড়ছে।

ভাষাগত দিক থেকে হিন্দির কাছে বাংলা ভাষা বিপন্নপ্রায়। দেশের বাচ্চা শ্রেণী থেকে শুরু করে অনেক বৃদ্ধ লোকও হিন্দি বলে নিজের বাড়তি জ্ঞানের পরিচয় দিতে চায়। এখন পর্যন্ত এ থেকে সুরক্ষার কোনো ভাবনা সরকারের নেই। ভারতীয় ৪০টির মতো চ্যানেল দেখানো হয় এ দেশে; তার মধ্যে ৩০টিই হিন্দি ভাষায়। শিশুরা যেসব কার্টুন দেখে তাও হিন্দিতে অনুবাদ করা। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কোন চ্যানেল এখনো ভারতে দেখানো হয় না। ভারতীয়রা জানে, তাদের চেয়ে বাংলা সাংস্কৃতি অনেক অনেক শক্তিশালী। বাংলাদেশী চ্যানেল দেখালো ভারতীয় প্রজন্ম তাতে আকৃষ্ট হবে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীকভাবেও ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উদ্বিগ্ন অভিভাকেরা বলছেন, নগরজীবনে যেখানে খেলার মাঠ ইতিহাস হতে চলেছে, বসার বারান্দা যেখানে শিশুর বেড়ে ওঠার জায়গা, সেখানে কার্টুন চ্যানেলের বোতাম আটকানো কঠিন। আর এ সুযোগটাই নিচ্ছেন ভারতীয়রা। এখানে তারা তাদের সনাতন ধর্মের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী তুলে ধরার সুযোগ নিচ্ছেন। এসব দেখে দেখে বড় হচ্ছে আমাদের শিশু-কিশোরেরা। দেশের শিশু-কিশোর এবং তরুণী ও গৃহবধূরা হিন্দি ভাষায় দারুন কথা বলতে পারেন। এটি হিন্দি চ্যানেল দেখে দেখে শেখা। তরুণী-তরুণেরা যারা এসএমএস করেন বন্ধুদের, তারা এখন প্রায় কথা হিন্দিতে লিখে থাকেন। ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেটেও দেখা যায় হিন্দি ব্যবহার করতে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে সিরিয়াল ও সিনেমার নামে যা দেখানো হচ্ছে এর একটা প্রভাব পড়ছে পরিবারে তরুণী বধূদের ওপর। তরুণেরাও এর প্রভাব থেকে দূরে নন। পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, ভণ্ডামি, অবৈধ যৌনজীবন, পরকীয়াসহ বিভিন্ন বিষয়কে উসকে দিচ্ছে এ মাধ্যম- এ রকম মন্তব্য সংস্কৃতি পর্যবেক্ষকদের।

এসব টিভি চ্যানেল ও সিনেমায় ব্যবহৃত পোশাক এবং নায়ক-নায়িকার শরীরের গঠন তরুণ-তরুণীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই ঈদ-উৎসব এলে ভারতীয় পণ্যের বিশাল বাজার হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ভারতীয় নায়িকা, সিরিয়ালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামে পোশাক-আশাক থেকে কানের দুল পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এখানে।

সাংস্কৃতিক এই আগ্রাসন এবং আমাদের সচেতনতার অভাবে দারুনভাবে হিন্দির কাছে নুইয়ে পড়ছি আমরা। আমাদের সাংস্কৃতি নীতিমালা না থাকায় এ আগ্রাসন ঠেকানো যাচ্ছে না কোনভাবেই। তাছাড়া মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে আমাদের অভিভাবকরাও ততটা সচেতন নন। কিন্তু ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আশু রোধ করতে না পারলে আমরা ক্রমেই জাতিগতভাবে নতজানু হয়ে পড়বো।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....ফিচার .....

বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষেরা চাল কিনতে না পেরে পরিবর্তন করছেন খাদ্য অভ্যাস

অংশু মোস্তাফিজ

দেশে আকাশছোঁয়া নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। অনেক আগেই ক্রয় ক্ষমতা অতিক্রম করেছে খাদ্যপণ্যের দাম। এ অবস্থায় দেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবার কেনা কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের ব্যয়ের তুলনায় আয় বাড়েনি। উল্টো দিনদিন কমছে কর্মক্ষেত্র। ফলে হাহাকার বাড়ছে দরিদ্রদের জন্য। গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কটে কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধপ্রায়। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান তো নেই-ই, পুরনো কর্মীরাও প্রতিনিয়ত চাকরি হারাচ্ছেন। গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ না পেয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর ১২ হাজার ফ্ল্যাট পড়ে আছে অবিক্রীত অবস্থায়। স্বাভাবিক কারণেই নতুন উন্নয়নকাজ বন্ধ এবং কাজহীন হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ নির্মাণশ্রমিক। সরকারিভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিকল্প মাধ্যম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ধেকই অপূর্ণ রয়ে গেছে। বার্ডফ্লু এবং আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ৪০ হাজার পোলট্রি ফার্ম। বন্ধ হয়েছে কয়েক লাখ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। গ্যাস বিদ্যুতের পাশাপাশি সুতোর দাম বাড়ায় দেশের ২৫ লাখ তাঁতি বেকার সময় পার করছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ঢাকায় নতুন নতুন সড়ককে ভিআইপি ঘোষণার ফলে সীমিত হয়ে এসেছে রিকশাচালকদের কর্ম এলাকা। শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া নতুনদের পাশাপাশি কর্মহীন হওয়া পুরনোদের ভিড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে চাকরিপ্রার্থী বেকারের লাইন।

অন্য দিকে গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ করা খোলাবাজারে বিক্রির চাল চলে যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ঘরে। এসব চাল প্রতিদিনই উদ্ধার হচ্ছে ডিলার এবং কালোবাজারিদের গুদাম থেকে। অনেক জায়গায় ফেয়ার প্রাইসে খাদ্য বিক্রি করা হচ্ছে ভুতুড়ে ঠিকানায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কথা বললে জিনিসপত্রের দাম আরো দ্রুত বাড়ে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় সমাজের একশ্রেণীর মানুষ বেশ ভালো থাকলেও নিম্ন ও নির্ধারিত আয়ের মানুষদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে। বাজারে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও লাখ লাখ দরিদ্র পরিবারের সামর্থ্য নেই সে খাদ্য কেনার। স্বাভাবিক কারণেই ওই সব ঘরে খাদ্যের জন্য হাহাকার বাড়ছে। বাড়ছে একবেলা-আধবেলা খেয়ে দিন কাটানো মানুষের সংখ্যা। চরম অভাব-অনটনের মধ্যেও গরিব মানুষেরা ওএমএস-এর চাল কিনতে তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না। এই সুযোগে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত ডিলারেরা কামিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা। দেশের মঙ্গাকবলিত বলে পরিচিত উত্তরাঞ্চলের বিত্তহীন মানুষেরা খাবারের অভ্যাস পরিবর্তন করছেন। অনেক এলাকার দরিদ্ররা এক বেলা খাবার বন্ধ করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। অনেকে ভাতের পরিবর্তে গমের রুটি খাবারের ব্যবস্থা করছেন। তাছাড়া নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে ভাতের পরিবর্তে আলু খাবার হিসেবে আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com

.....ফিচার .....

একজন ক্লিওপেট্রার আশায় তিনবেলা হাত বাড়াই

.....

পাদটিকাঃ লেখাটি অক্টোবর ২০০৯ সালের; এপ্রিল ২০১১ তেও দেশের ধর্ষণ- গণধর্ষণ বিষয়ক প্রেক্ষাপট একই। এমনকি আরো ভয়াবহ। তাই লেখাটি যৎসামান্য পাল্টানো হলো- লেখক

.....

অংশু মোস্তাফিজ

একটি মেয়ের প্রতি অমানবিকতার চূড়ান্ত পর্যায় ধর্ষণ। শেষ পর্যায় গণধর্ষণ। মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর ধর্ষণ। মৃত্যু একটা মানুষের সবকিছু একবারেই শেষ করে দিতে পারে কিন্তু ধর্ষণের ফলে একটা মেয়ের স্বাভাবিক জীবনের মৃত্যু ঘটে, তারপর অবশিষ্ঠ জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হয় অভাষ্য সব ভার।

সম্প্রতিক একটি মাসের বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্ষনের ঘটনা তুলে ধরছি। প্রত্যকটা ঘটনা আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপটের হলেও প্রতিক্রিয়া একই। অক্টোবর মাসের শুরুতে দেশব্যাপি একটি ধর্ষণ ছিলো

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ঢাকার কামরাঙ্গিচরের ধর্ষনের ঘটনাটি সেপ্টেম্বরের শেষের হলেও জানা গিয়েছিল অক্টোবরের শুরুতেই। তরুনীকে জোরপূর্বক নৌকায় তুলে গণধর্ষণ করেছিল ছয়জন। তারপর নৌকা থেকে নামিয়ে এক নেতা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দ্বিতীয়বার করে গণধর্ষণ। এখানেই শেষ নয়, বাধা দিলে তৃতীয়বারের মত তরুনীটির বাবাকে বেঁধে তার সামনেই মেয়েকে করা হয় গণধর্ষণ। সেদিন পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল চোখের সামনে মেয়ের অবস্থা দেখে। মেয়েটি ঢাকা মেডিকেলে যন্ত্রণায় কাতরিয়েছে দীর্ঘদিন। এ এক সভ্যতার সবচেয়ে অমানবিক অধ্যায়। তারপর নীলফামারীর জলঢাকায় দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় নিজ বাড়িতেই। একটা মেয়ের কাছে তার নিজ বাড়িও হতে পারেনি নিরাপদ আশ্রয়। ঢাকার সায়েদাবাদে তিন পরিবহণ শ্রমিক গণধর্ষণ করে এক কিশোরীকে। পরিবহণ শ্রমিক আর কি, যখন দিনাজপুরে পুলিশের কাছে আশ্রয় নিয়ে তাদের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি সেই ইয়াসমিন! জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে কিশোরীর মুখে কাপড় বেঁধে ধর্ষণ করা হয়। তারপরের ঘটনাটি বিশেষ আলোচিত। যশোরের এক নেতার ক্লাস টেন পড়ুয়া মেয়েকে শিশির নামের এক রাজনৈতিক কর্মী শাখা সিঁদুর পরিয়ে করে ধর্ষণ। আশ্চর্য দেশ, রাজনৈতিক নেতাও বাঁচাতে পারেনি নিজ কন্যাকে। সাধারণ মানুষের ঠিকানা কোথায়? যশোরের আরেক কিশোরী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীকে তিন যুবক গণধর্ষণ করে এবং মোবাইলে ভিডিও করে তা বাজারে ছাড়ে। সম্প্রতি একই ঘটনা ঘটেছে গাইবান্ধা, ফরিদপুর, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরায়। এদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক এমনকি রাষ্ট্রীয় আবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াই? জয়পুরহাটে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ মামলায় আসামীকে অব্যাহতি দিয়েছে আদালত। গাইবান্ধায় এক ভন্ড ফকিরের কাছে ধর্ষণের শিকার হয়েছে গৃহবধু। এর আগে গাইবান্ধায় একজন ফতোয়াবাজ ধর্ম শিক্ষক বিধবাকে ধর্ষণ করে ধরা পড়ার পরেও বিধবারই মাথার চুল কেটে দিয়েছিলো। এটাও ছিল এক ধরণের ফতোয়া! সাতক্ষীরার প্রেমিকা কলেজ ছাত্রীকে যশোরের হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে প্রেমিক। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিলো মেয়েটিকে। নারায়নগঞ্জে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে মাসের শুরুর দিকে। বগুড়ার শাহাজাহানপুরে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। গাজিপুরের সাত বছরের শিশু ধর্ষিতা হবার পর হাসপাতালে যে আর্তনাদ করেছে সেটা নিশ্চয় পৌঁছেছে দেশবাসীর কানে। রাজবাড়িতে আট বছরের শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বরিশালে সাত দিন আবাসিক হোটেলে আটকে রেখে তরুনিকে করা হয়েছে গণধর্ষণ। মানিকগঞ্জের চার বছরের শিশুকে ধর্ষণ- কি ভাবে কল্পনা করা সম্ভব ? নওগাঁর পোরশায় ১২ বছরের এক কিশোরীর বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের আট দিন পরেই স্বামীর বাড়ি থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করা হয়েছে চারদিন। রাঙ্গামাটিতে আবাসিক হোটেলে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে আদিবাসী তরুনীকে। চুয়াডাঙ্গায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের মূল্য দেয়া হয়েছে ১১ হাজার টাকা। অক্টোবর ২০০৯ সালের কয়েকটি ধর্ষণের আলোকপাত করা হয়েছে উপরে। তখন আরো নীলফামারীর ঐ নতুন বউয়ের কথা মনে পড়েছিল যে অসুস্থ্য হয়ে চিকিৎস্যা করে ফেরার সময় ১৫/১৬ জন যৌনদস্যুর কামনার শিকার হয়েছিলো। এমন শরীর শিউরে ওঠা অনেক ঘটনা ম্লান হয়ে যায় যখন আত্মস্বীকৃত রসু খাঁ বলে ফেলে এগার নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার এক একটি কাহিনী।

সময় আরো গড়িয়েছে। এখন ২০১১। একই বাংলাদেশ। একই চিত্র। এমনকি আরো ভয়বহ। প্রেক্ষিত এবং পরিপ্রেক্ষিতে কোনভাবেই দেশে ধর্ষণ- গণধর্ষণের ঘটনা কমেনি। এখন ধর্ষণ মানে হত্যার মঞ্চও। এখানে অকল্পনীয় এক একটি ধর্ষণ করা হয় এবং ধর্ষণের পরে বিভৎসভাবে হত্যা

করা হয় ধর্ষিতাকে। কখনো পাহাড় কিংবা উঁচু ভবনের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে। শ্রেণী কক্ষে। রাস্তায়। ক্ষেতে। উপসনালয়ে। বাংলাদেশের সমগ্র অংশই এখন ধর্ষণের লীলাভূমি। যে যেখানে ইচ্ছে করছে, ধর্ষণ করছে। সম্পর্ক এখন আর কোন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সামাজিক বিচারে যে সম্পর্কগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকানো নিষেধ, এখন বাংলাদেশে সেই সব সম্পর্ক থেকেও বেরোচ্ছে ধর্ষণের গল্প। হতাশ মেয়েগুলো করছে আত্মহত্যা। লক্ষ্যণীয়, ধর্ষণের শিকার অন্তত পঞ্চাশ ভাগ মেয়ে ধর্ষণের আগে অপহরণের শিকার হচ্ছে। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই অবাস্তব। অচিন্তিনীয় কিংবা নিষ্ক্রিয়। অবস্থার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকদের ধর্ষণের সমর্থক বললেও অতি সম্ভবত বাক্যের প্রতি অবহেলা করা হবে না।

সমাজ সব সময় একজন ধর্ষিতা মেয়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এমনকি ধর্ষিতাকে দোররা মারারও ফতোয়া জারি করে। যেখানে ধর্ষিতার জন্য সমাজের থাকা উচিত দূঃখবোধ সেখানে উল্টো তাকে আরেকবার শ' শ' মানুষের সামনে করা হয় দোররা নামের উন্মুক্ত এক ধর্ষণ। মফস্বল এলাকায় সমাজের বয়স্ক পুরুষরা ধর্ষিতাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করায়। নানান ধরণের প্রশ্ন করে। শুনতে চায় ধর্ষণের বিবরণ। গণধর্ষণ হলে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। ধর্ষিতা বাবা মায়ের সামনে তার ধর্ষণের বর্নণা দেয়। আনন্দে টলমলিয়ে ওঠে বিচারের আসর। ধর্ষিতার মুখ থেকে বেরুনো প্রতিটা কথা হয়ে ওঠে লোভনীয়। উপস্থিত সবাই ধর্ষকের মতোই তাকে নিজের মত করে ভোগ করে। বিশেষ করে ঐ বিচারের আয়োজক মৃতপ্রায় পুরুষরা। এরা বয়সের কারণে দীর্ঘদিন থাকে সেক্স বঞ্চিত। ফলে এমন একটা লাইভ গল্পে নিজেদের বেশি করে জড়িয়ে মানসিকভাবে সেক্স করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। আবার ফতোয়াবাজরা নিজেও ধর্ষণের সাথে জড়ানোর পর নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণ করতে ধর্ষিতাকে দোররা মারে। সমাজের পরে ধর্ষিতাকে মুখোমুখি হতে হয় নিজ পরিবারের। এটা অবাক করা ব্যাপার। গ্রাম অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ এখনো অশিক্ষিত। এরা তখন নিজের ধর্ষিতা মেয়েটার কথা চিন্তার চেয়ে সমাজকে বড় করে দেখে।

ধর্ষন প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিবর। প্রতিটা ধর্ষণকে রাষ্ট্র হয়তো বলবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু এমন ঘটনা যখন দিন রাত্রে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে তখন এটা কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকে না। রাষ্ট আর কি করবে, যখন মানুষ খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি খুব স্বাভাবিক শব্দ হয়ে গেছে। অথচ রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিক হিসেবে প্রতিটা মানুষের নিরাপত্তা দেয়া। কিন্তু রাষ্ট্র যখন নিজেই নিরাপদ নয়(!), তখন আর ১৬ কোটি মানুষকে কিভাবে দেবে নিরাপত্তা? বেশ কিছুদিন দেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা কমেছে। রাষ্ট্র যদি ধর্ষণের জন্য আরো কঠোর নিশ্চিত শাস্তির ব্যবস্থা করতো তাহলে কমতো ধর্ষণের ঘটনাও। রাষ্ট্র যদি প্রমাণসাপেক্ষে ধর্ষককে ফাঁসি কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাতো তাহলে ধর্ষণ কমতো। সম্প্রতি পোলান্ডে আইন পাশ করা হয়েছে যে, ধর্ষণ করলে ধর্ষককে শাস্তি দেবার পর রাসায়নিক উপায়ে যৌন শক্তি কমিয়ে দেবে। আমাদের রাষ্ট যদি এমনও আইন করতো তাহলে ধর্ষণ কমতো। কিন্তু রাষ্ট্র কি এমন কিছু করবে? রাষ্ট্রের কাছে কি নারীর জীবনের দাম এতটুকু রয়েছে! রয়েছে কি দায়বোধ?

এ লেখায় ড. হুমায়ুন আজাদ'র ধর্ষণ প্রবন্ধ থেকে কিছু সংকলিত অংশ যোগ করছি। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'নারীর উপর পুরুষের বল প্রয়োগের চরম রুপ ধর্ষণ। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে ধর্ষণ প্রবণ সমাজের একটি; মনে হচ্ছে পৌরানিক দেবতারা আর ঋষিরা দর বেঁধে জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশে। ধর্ষণের সব সংবাদ অবশ্য জানা যায় না, সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ধর্ষিতারাই তা চেপে রাখে; কিন্তু

যতটুকু প্রকাশ পায় তাতেই শিউরে উঠতে হয়। বাংলাদেশে এককভাবে ধর্ষণ করা হয় এবং দলবেঁধে ধর্ষণ করা হয়; এবং ধর্ষণের পর ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়। এখানে সহপাঠী ধর্ষণ করে সহপাঠিনীকে, গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করে ছাত্রীকে, ইমাম ধর্ষণ করে আমপাড়া পড়তে আসা কিশোরীকে, দুলাভাই ধর্ষণ করে শ্যালিকাকে, শ্বশুর ধর্ষণ করে পুত্রবধুকে, দেবর ধর্ষণ করে ভাবীকে; এবং দেশ জুড়ে চলছে অসংখ্য অসম্পর্কিত ধর্ষণ। বাংলাদেশ আজ ধর্ষণকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। বাংলাদেশে নারী বাস করছে নিরন্তর ধর্ষণভীতির মধ্যে। চাষীর মেয়ে মাঠে যাবে- সে আর কোন ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি স্কুলে বা মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে- সে আর কোন ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি বাইরে যাবে- সে আর কোন ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের। ধর্ষিত হওয়া নারীর জন্য মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক; ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ধসিয়ে দেয় নারীর জীবনের ভিত্তিকেই। পুরুষের প্রতিটি আচরণই তার কাছে ধর্ষণ মনে হয়। বাংলাদেশে মাস্তান ছাড়া সবাই অসহায়; তাই বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে ধর্ষণের লীলাভূমি।

শুধুমাত্র নারী হবার অপরাধে(!) নারী পুরুষ কর্তৃক অমানবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ের শিকার হচ্ছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অচরণ দেখে নিজের পুরষত্ব নষ্ট করতে ইচ্ছে করে। তাতে অন্তত একটা পুরুষের কালো থাবা থেকে মুক্তি পাবে নারী। আজ যখন মানুষের মনুষত্ববোধ ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে নিশ্বেসপ্রায়, যখন ধর্ষণ-গণধর্ষণ বনাম রাষ্ট্রের ভূমিকা এমন, যখন নিজের ক্ষমতার এমন সীমবদ্ধতা তখন আমি প্রতিদিন মনে মনে সরনাপন্ন হই একজন নারীর আগমনের কামনায়। যার নাম ক্লিওপেট্রা। প্রতিদিন কামনা করি এদেশে জন্ম নিক রসু খাঁর মতো কয়েকজন ক্লিওপ্রেটা। যারা প্রতিদিন নারী ধর্ষণের বদলা নেবে ঐসব একেকজন পুরুষকে নিশ্বেস করে ভোগ করার পর ব্রাশফায়ারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ।
সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২
ই-মেইলঃ aungso1987@gmail.com